ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™ SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ।। ১৯ বৈশাখ ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ৩ মে, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

মমতা-তৃণমূলই কংগ্রেসের প্রধান প্রতিপক্ষ

গূঢ়পুরুষ।। রাজ্যের পুর নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সঙ্গেই নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয়েছে। কিন্তু তা মানা হচ্ছে কিনা দেখবে কে? দেখার দায়িত্ব অবশ্যই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। এই কমিশন পুরোপুরি বামফ্রন্ট সরকারের উপর নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের মতো স্বশাসিত সাংবিধানিক সংস্থা নয়। কাগজে কলমে অবশ্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনও স্বশাসিত। তবে সেটা নামেই। এই কমিশনের পরিচালকদের নিয়োগপত্র, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা রাজ্য সরকারের মর্জিতেই হয়। রাজ্য সরকারের বশংবদ কোনও অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস আমলাকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের প্রধান পদে বসানো হয়। অর্থাৎ আনুগত্যের পুরস্কার দেওয়া হয়। অনেকটা যেমন পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য পদে অনুগত ব্যক্তিদের বসানো হয়। দলতন্ত্র ও দলদাসদের রাজত্বই সর্বত্র চলছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনও তার বাইরে নয়। তাই পুর নির্বাচনে নিরপেক্ষতার আশা করাটা বোকামি হবে।

মনে রাখতে হবে পুলিশ প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন সবই বামফ্রন্ট সরকারের নিয়ন্ত্রণে। এতকাল এইসব খুঁটির জোরেই বামপন্থীরা নির্বাচনে তিন দশকের বেশি সময়ে জিতে এসেছে। যথেচ্ছ রিগিং করেছে। ভোটের দিন সকাল থেকে ক্যাডাররা দাপিয়ে বেড়িয়েছে। এবারেও তার অন্যথা হলো না। সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু তো হুমকি দিয়েছেন যে দলের ক্যাডারদের প্রতিরোধ করতে গেলে নির্বাচনের দিন রক্তগঙ্গা বইবে। সন্দেহ নেই এবার রাজ্যজুড়ে পুর নির্বাচনে পরাজয় ঠেকাতে সি পি এম ক্যাডাররা মরিয়া চেষ্টা চালাবে। সন্ত্রাস হবে তাদের হাতিয়ার। বামপন্থীরা সাধারণভাবে অতি ক্ষমতালোভী। তারা দেহত্যাগ করতে পারে। কিন্তু পদত্যাগ করে না। ক্ষমতা ধরে রাখতে তারা যে কোনও পথ নিতে পারে।

এমন একটি পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রধান বিরোধী জোট তৃণমূল ও কংগ্রেস যেভাবে আসনরফা নিয়ে খেয়োখেয়ি করছে তা দেখেশুনে বামবিরোধী ভোটদাতারা হতবাক। সকলের মনেই প্রশ্ন যে আসন নিয়ে যারা এতটা নোংরামি করছে তারা নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা পেলে কীভাবে প্রশাসন চালাবে। আসনরফা নিয়ে কুৎসিৎ ঝগড়া, গোঁজ প্রার্থী দিয়ে একে অপরকে হারাতে মরিয়া চেষ্টা দেখে মনে হয় না যে এই দুই বিরোধী জোট শরিক সি পি এমকে তাদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বলে মনে করে। বাস্তবে রাজ্য কংগ্রেস নেতারা তৃণমূলকেই তাদের প্রধান শত্রু বলে মনে করে। অন্যদিকে, তৃণমূল নেত্রী বিশ্বাস করেন জনমত তাঁর পক্ষে। তাই কংগ্রেসকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে তিনি একাই সি পি এমকে নির্বাচনে হারাতে পারেন। তৃণমূলের কোনও জোট শরিকের প্রয়োজন নেই। এটি অতি দম্ভ। নিঃসন্দেহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সি পি এম বিরোধী জনপ্রিয় নেত্রী। কিন্তু সেই একক জনপ্রিয়তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একাই বামফ্রন্টকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। গত ৩৪ বছর টানা ক্ষমতায় থাকার সুবাদে সি পি এম তার দলীয় সংগঠন যেভাবে গড়েছে তা মমতা ঝড়ে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও শিকড়সহ উপড়ে পড়বে না। এই সরল সত্যটি তাঁর না জানার কথা নয়। রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের দোষারোপ করে লাভ নেই। মমতা নিজেই একদা রাজ্য কংগ্রেসে ছিলেন। তিনি জানেন সেখানে যারা আছে তারা অনেকেই সি পি এমের এজেন্ট। এই কংগ্রেসীরা তো চাইবেই জোটের নামে ঘোঁট পাকাতে। মমতা তো সব জেনেই এই 'তরমুজ নেতাদের' হাত ধরেছেন। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। এই রাজ্যে কংগ্রেস সি পি এমের তল্পিবাহক।

মমতা যাদের ভরসায় জোট করেছেন তারা প্রথম সুযোগেই পিছন থেকে ছুরি চালাবে। কারণ, সি পি এম নয়, প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান শত্রু মমতা ও তাঁর দল তৃণমূল।

আসনরফার খেয়োখেয়ি

দীপা দাশমুন্সী

মমতা ব্যানার্জী

মুসলিম সংরক্ষণ
সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ইঙ্গিত?

বি পি সাহা।। ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সংবিধানের ১৫(২) অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ধর্মের ভিত্তিতে কোনও নাগরিক বা সমাজকে কোনও তারতম্য বা অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশ্র অবশ্যই সংবিধান খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জানেন এবং বোঝেন। তথাপি তিনি কমিশন-এর রিপোর্টে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মুসলমানদের জন্য সরকারী চাকুরীতে দশ শতাংশ সংরক্ষণের সুপারিশ করেছেন। রিপোর্ট প্রায় দু' বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে। সরকার রিপোর্টটি জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। প্রকৃতপক্ষে, রিপোর্টটির মূল বক্তব্য এখনও জনগণের জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রিপোর্টটি খোলামনে বিশ্লেষণ করেছে কিনা, বা মুখ্যমন্ত্রী এটি খতিয়ে দেখেছেন কিনা, সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ জনগণের এখনও সংশয় রয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সংবিধানের ১৪ এবং ১৫ নং অনুচ্ছেদ বিশেষভাবে জানালেও, কেন তিনি সংবিধান বিরোধী সুপারিশ করেছেন, সেটাই একটা রহস্য। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মনে করেন, কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশ মতো, তাদের খুশি করতে তিনি এই মনগড়া রিপোর্ট তৈরি করেছেন। আর একদল বলেন, রিপোর্ট প্রকৃতপক্ষে লিখেছেন, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বা তার কোনও অনুগামী। বিচারপতি মিশ্র শুধু চোখ বুজে দস্তখত করেছেন। কারণ, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি কংগ্রেস নেতৃত্ব ও দলের কাছে বিশেষ ভাবে বাধিত এবং ঋণী। সুপ্রিম কোর্ট থেকে অবসর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতীয় মানব অধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ দায়িত্বের অবসান হলে, কংগ্রেস পার্টির পক্ষ থেকে তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। এর পরেই তাকে বিতর্কিত কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে দহরম-মহরমের দৌলতে মাননীয় প্রাক্তন বিচারপতি বাড়তি অর্থ, যশ ও প্রতিপত্তি ভোগ করেছেন। এ সব লোভনীয় লাভের বিনিময়ে তিনি যে অবশ্যই কংগ্রেস নেতৃত্বের অনুগত ও অনুগামী থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক। অতএব, কমিশনের রিপোর্টে অসাংবিধানিক, সমাজ, সম্প্রদায় বিভেদ

(এরপর ৪ পাতায়)

সোজা-সাপ্টা

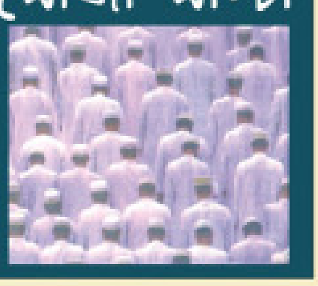

অনুন্নয়নকে পুঁজি করে প্রত্যন্ত সুন্দরবনেও মাওবাদী কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মাওবাদী সন্ত্রাস কবলিত জঙ্গলমহলের তিনটি জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন এলাকা। জঙ্গলমহল ছেড়ে মাওবাদী ক্যাডাররা এখন সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় ঘাঁটি গাড়ছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এবিষয়ে নিশ্চিত তথ্য সংগ্রহও করেছে।

পুলিশী সূত্র অনুসারে, সুন্দরবনকে পছন্দের কারণ হলো—সুন্দরবন বাংলাদেশের তোরণদ্বার, প্রবেশপথ। আয়লা-বিধ্বস্ত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় রয়েছে চরম দারিদ্র্য এবং অনুন্নয়নসহ হাজারো ব্যথা-বেদনা। যার ফলে মাওবাদীদের পা-রাখাটা বেশ সুবিধাজনক।

সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি পুলিশকে চিঠি লিখে সম্ভাব্য বিপদের সংকেত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''এটি এক গুরুতর বিপদ। মাওবাদীদের মদতে একটি কমিটি হয়েছে। পুলিশকে মাও-প্রভাব বাড়ার খবর জানিয়েছি। মাওবাদীরা সুন্দরবন এলাকার চার শতাংশে জনজাতি ছাড়াও

(এরপর ৪ পাতায়)

মুম্বাইয়ে নব্বই হাজার পাকিস্তানী ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে

মুজফ্ফর হোসেন।। আমরা মুম্বইবাসীরা বড়ই গর্ববোধ করি। কেননা মুম্বই-এর হাজারো বিশেষণ। কেউ বলেন, মায়ানগরী, কেউ ফিল্মনগরী, ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী, আবার কারও কথায় পৃথিবীর তিনজন (দেশের মধ্যে) ধনবান ব্যক্তি মুম্বইবাসী-প্রভৃতি। কিন্তু আমরা হয়তো বা জানি না যে, আমার সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে দাগী অপরাধীরা স্বচ্ছন্দে ঘোরা-ফেরা করছে। তাদের ক্ষমতা এতটাই যে, তারা যখন ইচ্ছে মুম্বইকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। কেউ-ই বা জানত ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর হামলা করার আগে কতজন পাকিস্তানী দুর্বৃত্ত মুম্বইয়ে এসেছে ও ফিরে গিয়েছে!

এসময়ে ২০১১-এর জনগণনা শুরু হয়েছে। বিশ্বস্ত সংবাদ হলো, ৯০ হাজার পাকিস্তানী মুম্বইয়ে অবৈধভাবে বহাল তবিয়তে বসবাস করছে। এই সংখ্যা আরও বাড়বে স্বাভাবিকভাবেই। মুম্বই মহানগর নিগমের ২০০৯-এ প্রকাশিত মানব-উন্নয়ন রিপোর্টে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সন্ত্রাসী হামলার পর কিছু পাকিস্তানী গা-ঢাকা দিয়েছে বা পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে, তবে তাতে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে ভাবাটা নেহাত মূর্খামি। মুম্বাই-এর এক কোটি ১৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪৫০ জন বাসিন্দার (সরকারি পরিসংখ্যান) মধ্যে পাকিস্তানীদের সংখ্যা ৮৯ হাজার ৮৩৮ জন। অর্থাৎ অঙ্কের হিসেবে মোট মুম্বইবাসীর প্রায় এক শতাংশ। কেউ হয়ত বলবেন এটা তো সিন্ধুতে বিন্দুবৎ। কিন্তু সামান্য পরিমাণ বিষই কতজনকে শেষ করে দিতে পারে তা আর বাড়িয়ে বলার আবশ্যকতা নেই। এই সংখ্যাতত্ত্বটা ২০০১-এর সেনসাস থেকে নেওয়া। এখন অপেক্ষা করতে হবে ২০১১-তে মুম্বাইবাসী পাকিস্তানীদের সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

গুটিকয়েক পাকিস্তানী কয়েক ঘণ্টায় মুম্বইয়ের ছবিটা কীভাবে কালিমালিপ্ত করেছিল তা সকলেরই স্মরণে রয়েছে নিশ্চয়ই। সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনের হতাশা, দুর্দশাগ্রস্ত ছবিটা ভোলা যায়নি। সেই দুর্দশার আজও লাঘব হয়নি।

(এরপর ১৫ পাতায়)

জঙ্গিদের গেটওয়ে?

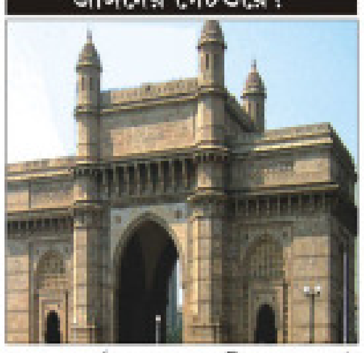

অনুপ্রবেশকারীদের ডিএনএ পরীক্ষা হবে

সংবাদদাতা।। অসমের রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীয়ন সূচী তৈরি করার ক্ষেত্রে কারও ভারতীয় নাগরিকত্ব বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে প্রয়োজনে ডি এন এ পরীক্ষা করা হবে। উল্লেখ্য, অসমের সর্ববৃহৎ ছাত্র সংস্থা আসু (অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন) বিগত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে অসম থেকে বিদেশী (পড়ুন বাংলাদেশী) বিতাড়নের জন্য সবরকম আন্দোলন করে আসছে। আসু'র উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য কেন্দ্র, রাজ্য ও আসু—ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। ২০০৫-এর মে মাসে প্রথম ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী ভট্টাচার্য আরও জানিয়েছেন বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে এবং তাদের বেশির ভাগ দাবী কেন্দ্র মেনে নিয়েছে। তবে আসুর পক্ষ থেকে কেন্দ্রকে 'অসম চুক্তি' কার্যকর করার জন্য সময়-সীমা নির্দিষ্ট করার দাবী জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর উদ্যোগেই 'অসম চুক্তি ১৯৮৫' স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

অসম

যাদের পূর্বপুরুষ অসমবাসী নন এরকম লক্ষ লক্ষ বিদেশী বাংলাদেশী অসমে ঢুকে পড়েছে। এইসব অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিক হওয়া থেকে শুরু করে নির্বাচনে লড়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। তবে এসবই পুরনো কাসুন্দি। কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে বৈঠকে স্বরাষ্ট্রসচিব জি কে পিল্লাই, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্ম সচিব নবীন ভার্মা, অসম রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যসচিব এন কে দাস, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি (স্বরাষ্ট্র দপ্তর) এস সি দাস এবং আসু'র পক্ষ থেকে সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য, সভাপতি শংকর প্রসাদ রাই ও তপন গগৈ যোগ দিয়েছিলেন। সমুজ্জ্বলবাবু জানিয়েছেন, সন্দেহভাজনদের ক্ষেত্রেই আসু' ডি এন এ পরীক্ষার দাবী জানিয়েছে। কেন্দ্র মেনে নিয়েছে। সম্ভবত, ভোট ব্যাঙ্কের খাতিরেই এর আগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডি এন এ পরীক্ষা অসম্ভব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life INSURANCE
With Us, Your's Sure

টালাপার্কে ঝুপড়ির সারি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কর্পোরেশন নির্বাচনের মুখে উঠে আসছে পার্ক-দখলের ঘটনা। উত্তর কলকাতার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে বড় পার্ক টালা পার্কও এই জবরদখলের জায়গায় গর্তও করা হয়েছে। ঘাসের উপর শুকোচ্ছে ভেজা জামা-কাপড়। ফুটপাথবাসীদের রুজি রোজগারের হাতে টানা রিক্সার স্ট্যান্ডও ওই পার্ক।

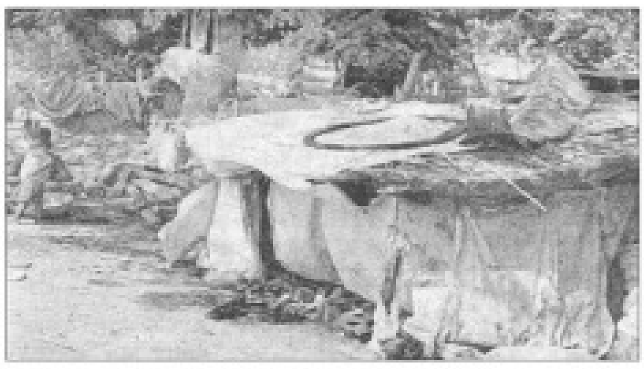

কবলে পড়েছে। সম্ভবত, টালা পার্ক উত্তর ও মধ্য কলকাতার বড় মাঠও বটে। চারদিক থেকেই দখল চলছে। প্রথমে ফুটপাথ তারপর পার্কের মাঠ। মাঠের ভিতরে চারদিক ঘিরে ফেলে তারপর ঝুপড়ি তৈরি হচ্ছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পার্ক ধীরে ধীরে বস্তির আকার নিচ্ছে। স্থানে স্থানে ত্রিপল, টালি, বাঁশ, দরমার কাঠামো এই বিখ্যাত পার্কের চেহারাটাকেই পাল্টে দিচ্ছে। পার্কে খাবার তৈরির জন্য জ্বলছে ডজন ডজন চুলো। আশপাশের গাছের ডালও জবরদখলকারীদের হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না। মাঠে মাটি খুঁড়ে কয়েক

বেলগাছিয়ার জৈন মন্দিরের গায়েই পড়ে রয়েছে বাড়ি তৈরির জিনিসপত্র। বেলগাছিয়া বস্তিতে জনকল্যাণ ও উন্নয়নের কাজও আশানুরূপ নয়। উন্নয়ন কর্মসূচীতে শিথিলতা রয়েছে। বস্তিবাসীদের অভিযোগ রয়েছে বি পি এল কার্ড, বিধবা ভাতা দেওয়া নিয়েও। ওখানে মুখ দেখে কার্ড দেওয়া হচ্ছে বলে খবর। এছাড়া যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং-এর কথাও উঠেছে।

আর জি কর রোডে অবৈধ পার্কিং করা হচ্ছে। ওয়ার্ড কমিটির সঙ্গে কথা বলে কাজ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

কালো টাকা উদ্ধার জলে গেল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিদেশে জমা ভারতীয়দের কালো টাকা উদ্ধারের ব্যাপারে স্বামী রামদেব, বিজেপি-র শীর্ষ নেতা আদবানী যতই সোচ্চার হোন না কেন, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরনোর আশংকায় খোদ কেন্দ্র সরকারই এ বিষয়ে জল ঢেলে দিল। গত ২৭ এপ্রিল রাজ্যসভায় অর্থদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এস এস পালানিকম্ স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইন মেনে বিদেশে জমা করা কালো টাকা দেশে ফেরৎ নিয়ে আসার ব্যাপারে কোনও সুযোগ নেই। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যে সব চুক্তি রয়েছে তাতেও কোনও সুযোগ নেই। তিনি আরও জানিয়েছেন, বিদেশে যেসব ভারতীয়দের কালো টাকা জমা রয়েছে সে বিষয়ে সরকারের কাছে কোনও প্রামাণ্য তথ্যই নেই। তবে তিনি বলেছেন, কেন্দ্রের 'প্রত্যক্ষ কর' বিভাগকে বলা হয়েছে, যেসব ভারতীয়দের টাকা জমা রয়েছে বলে সন্দেহ রয়েছে তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া যে সব এজেন্ট বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা রাখার জন্য একাউন্ট খুলতে সাহায্য করেন তাদের বিষয়েও খবর সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। যাদের নামে 'ফেরা' বা বিদেশী অর্থ অধিনিয়ম আইনে অভিযোগ আছে তাও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে।

নানাজীর স্মৃতি সংরক্ষণে দীনদয়াল ইন্সটিটিউট

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নতুন দিল্লীর দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউট ঋষিকল্প ব্যক্তিত্ব সদ্যপ্রয়াত আর এস এস-এর প্রবীণ প্রচারক নানাজী দেশমুখের সম্পর্কে বিবিধ তথ্য সংকলিত করে রাখার উদ্যোগ নিয়েছে। এই কাজের জন্য একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা কোর গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের প্রধান বীরেন্দ্রজিৎ সিংহ এবং প্রধান সম্পাদক ভরত পাঠক যৌথভাবে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই মর্মে এক আবেদন জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, যাঁরাই নানাজীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অথবা বিভিন্ন ঘটনার কথা জানেন, সংস্মরণ বা স্মৃতিচারণ, তথ্য-প্রমাণাদি একত্রিত করে তাদের কাছে পাঠান। নানাজী সম্বন্ধে তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত প্রবন্ধ বা সংবাদ, নানাজীর নিজের লেখা, যে কোনও স্থানে যে কোনও অনুষ্ঠানের ছবি যদি কারও কাছে থাকে তা যেন তারা অনুগ্রহ করে দিল্লীর দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউটে পাঠিয়ে দেন। নানাজীর সম্পর্কে অডিও-ভিডিয়োও চেয়েছেন বীরেন্দ্রজী এবং ভরত পাঠক।

যারা লিখতে পড়তে পারেন না তাঁরা কারও মাধ্যমে যদি ফোনে, চিঠিতে বা ইলেকট্রনিক মেলে দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউটে নাম-ঠিকানা জানান, সংস্থার প্রতিনিধি তাদের কাছে গিয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করে নিয়ে আসবেন।

যাঁরা স্মৃতিকথা ও তথ্যাদি পাঠাবেন তাঁরা যেন নিজের নিজের নাম ঠিকানা স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে লিখে পাঠান। ঘটনার বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে যেন ঠিক ঠিক স্থান-কাল-পাত্র উল্লেখ করেন। চিঠিপত্রের মূল কপি দিলেই ভালো হয়।

ডাকযোগে পাঠানোর ঠিকানা—

দীনদয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউট
৭ই, স্বামী রামতীর্থ নগর
রাণী ঝাঁন্সি রোড
ঝাণ্ডেওয়ালা এক্সটেনশন
নতুন দিল্লী-১১০০৫৫
দূরভাষ : ০১১-২৩৫২৬৭৩৫
ফ্যাক্স-০১১-২৩৫৪-২৮২১

স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ব্যতিক্রমী প্রাবন্ধিক প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডুর বই পাওয়া যায়

★ দে'জ ★ দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রীট ★ সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া স্টেশন ★ কেশব ভবন, ৯এ, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬

পাঠক মহোদয়! বইগুলির পাতা উল্টিয়ে দেখতে পারেন। দেশভাগ ও তার আগেপরের কাহিনী জানতে পারবেন।

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী চিন্তাবিদ শিবপ্রসাদ রায়, শান্তনু সিংহ, কৃষ্ণকান্ত সরকার, শ্রী দেবজ্যোতি রায় ও নিত্যরঞ্জন দাস প্রভৃতি লেখকের অসাধারণ বইগুলি অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

দিবাস্বপ্ন নয় আতঙ্কজনক ছবি ♦ রক্তে যদি আগুন ধরে ♦ মাতৃভূমী হিন্দু শয়তানেরা ঘুমোয় না ♦ আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি আমি স্বামীজি বলছি ♦ বৈদিক তথা হিন্দু ধর্মের ভূমিকা হিন্দুধর্ম, সভ্যতা ও ধর্মান্তরকরণ ♦ অপারেশন ছাড়াই হার্ট ব্লকেজের চিকিৎসা মুসলিম রাজনীতি ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ রিজওয়ান-প্রিয়াঙ্কার বিয়ে ও তসলিমা বিতাড়ন ♦ অতিথিবিহারী, তসলিমা এবং.... মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ ♦ কাশ্মীর থেকে অমরনাথ

তপন কুমার ঘোষ ও নিত্যরঞ্জন দাস রচিত নতুন প্রকাশিত বইটি

ধর্ম – ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলামি জেহাদ

এছাড়া আরও বিভিন্ন বইগুলি পাঠকদের মনে বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছে

তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩

এই সময়

যুদ্ধের মহড়া

ভারত-পাকিস্তানের এখন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চলছে। পাকিস্তানে সেখানকার মরুভূমিতে ৫০ হাজার সেনা, ট্যাঙ্ক আর যুদ্ধ বিমান যৌথভাবে যুদ্ধের মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে। গত দু' দশকের মধ্যে এটাই পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ যুদ্ধের মহড়া। আগে থেকেই সতর্ক করে দেবে এমন সুইডিশ এরিআই এয়ারবোন র‍্যাডার, ইউক্রেনিয়ান ১১-৭৮ ট্যাঙ্ক, এফ-১৬ ফাইটার জেট বিমানও এই মহড়াতে সামিল হয়েছে। অন্যদিকে ভারতেও রাজস্থানের মরুভূমিতে সামরিক বাহিনীর মহড়া শুরু হতে চলেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে যোধা শক্তি মহড়া, মথুরা ভিত্তিক I Corps-এর ২৫ হাজার সেনা এই মহড়ায় অংশগ্রহণ করবে। সেনাবাহিনীর নতুন 'কোল্ড স্টার্ট' আক্রমণাত্মক তত্ত্বকে বৈধতা দেওয়াই এই মহড়ার লক্ষ্য।

সৌরোজ্জ্বল মুম্বাই

আর কয়েক মাসের মধ্যেই মুম্বাই-এর হোর্ডিংগুলো জ্বলজ্বল করে উঠবে। তবে বিদ্যুত নয়, সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তা করা হবে। মহারাষ্ট্রের শক্তিমন্ত্রী গণেশ নায়েক মুম্বাইয়ের হোর্ডিং ও বিলবোর্ডে সৌরশক্তি ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করা হবে বলে জানিয়েছেন। এই প্রস্তাব অবশ্য নতুন নয়। মুম্বাই-এর প্রাক্তন মেয়র শুভ রাওয়াল তার আমলে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, এটা শুরু হলে মুম্বাইয়ে প্রতিদিন ১৫ হাজার শক্তির সাশ্রয় হবে।

সরকারি-বনধ্

পরিবহন মন্ত্রী নিজে আশ্বাস দিতে পারেননি, গাড়ি-ঘোড়াও চলেনি। যারা কপাল ঠুকে পথে বেরিয়েছিলেন তারা বিপদে তো পড়েছেনই, সেইসঙ্গে কেউ কেউ ক্যাডারদের হাতে প্রহৃতও হয়েছেন। অসুস্থ ক্যান্সার রুগীকেও রেহাই দেয়নি ক্যাডারবাহিনী। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যানের হুঁশিয়ারির (পড়ুন রক্তাক্ত নির্বাচন) বাস্তবে পরিণত করতে রিহার্সালটা সেরে রাখল ক্যাডারকুল। তবে এতদ্ সত্ত্বেও বেশিরভাগ ক্যাডারই বসে গেছে—পথে নামেনি। পরিবহন স্তব্ধ করার জন্য বিমানবাবু ধন্যবাদ দিয়েছেন দলীয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের। সরকারি কর্মীরা রাজনৈতিক দল করতে পারবে না বলে যে আইন আছে, তা কি শুধু খাতায় কলমে?

'জঞ্জাল সাম্রাজ্যবাদ'-এর জালে ভারত

বিশ্বের উন্নত দেশগুলি ছলে-বলে-কৌশলে। নিজেদের দেশকে সবুজায়ন করে বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ থেকে মুক্ত করতে তৎপর। শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের এক নতুন অধ্যায়। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের তুতিকোরিনে স্পেনের একটি জাহাজ ধরা পড়েছে। বার্সিলোনাবাসীদের বর্জ্য দেশ থেকে ঝেড়ে ফেলার তালে ছিল জাহাজটি। তাই ছোট্ট বন্দরে পাড়ি জমিয়েছিল। কিন্তু পারেনি। সটান ফেরৎ পাঠানো হয়েছে 'দুর্গন্ধমাদন'কে। তবে সৌদি আরব থেকে আসা বর্জ্য ভর্তি জাহাজ তুতিকোরিনে দাঁড়িয়ে আছে। বর্জ্য থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। গত বছরই মালয়েশিয়া, সৌদি আরব এবং স্পেন থেকে এরকম জঞ্জালবাহী জাহাজ এসেছিল। এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কার, দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী গ্রাম-গুলোকেই 'ডাম্পিং গ্রাউন্ড' হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে উন্নত দেশগুলো।

ক্ষুদ্রতম স্যাটেলাইট

আসতে চলেছে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম স্যাটেলাইট। আর এই স্যাটেলাইটের উদ্ভাবক জনা চল্লিশেক ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক ছাত্র। ব্যাঙ্গালোরে চারটি ও হায়দরাবাদের তিনটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ওই স্নাতকেরা মিলে এই ক্ষুদ্রতম স্যাটেলাইটটি তৈরি করেছে যার আয়তন ১০ সেমি ১০ সেমি ১৩.৫ সেমি (১৩৫০ কিউবিক সেমি)। এই প্রকল্পে খরচ পড়েছে প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা। এটি মহাকাশে যাবে আগামী ৯ মে।

টুইটারে 'কমিউনিস্ট'

ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো স্যাভেজ নিজেকে কতটা মহান কমিউনিস্ট ভাবেন তা জানা নেই। কিন্তু বঙ্গজ কমিউনিস্টরা তাঁকে যে স্ট্যালিনের সমকক্ষ বলেই মনে করেন তার নিদর্শন বিগত কয়েক বছর পূর্বে স্যাভেজ-এর বঙ্গদেশে পদার্পণ মাত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে। এহেন ভাবার একমেবদ্বিতীয়ম কারণ—হুগোর মার্কিন বিরোধিতা। সেই হুগো স্যাভেজই আমেরিকান মাইক্রো-ব্লগিং সাইট টুইটারে যোগ দিয়েছেন সম্প্রতি। কারণ দীর্ঘ বক্তৃতার পরিবর্তে মাত্র একশ' চল্লিশ শব্দেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন স্যাভেজ তাঁর মন্তব্যকে। হুগোর এই 'আমেরিকা-প্রেম'কে বঙ্গজ কমিউনিস্টরা কিভাবে দেখবেন তা দেবাঃ ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যঃ।

চীনা খুনী

নিহত হলেন ৩৪ বছর বয়সী ভারতীয় ডাক্তার বিজেন্দর তুর। তাঁকে খুন করল এক চীনা, নাম লিশান ওয়াং। তার বাড়ি বেজিং। সেও পেশায় ডাক্তার। কর্মসূত্রে নিহত ভারতীয় এবং চীনা খুনী দু' জনেই থাকতেন আমেরিকায়। বিজেন্দর ইয়েল স্কুল অব্ মেডিসিনে পোস্ট-ডক্টোরাল ক্লিনিক্যাল ফেলো পদে কর্মরত ছিলেন। গত ২৭ এপ্রিল কানেক্টিকাটের ব্রাণ্ডফোর্ডে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটে। মার্কিন পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ওই চীনা হত্যাকারী ওয়াংকে গ্রেপ্তার করে। খুনের কারণ নিয়ে তদন্ত করছেন তারা।

ফাঁদে মনমোহন

বেকায় বিপাকে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি-র জনা পঞ্চাশেক সংসদ স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব এনেছেন সাংসদে গত ২৭ এপ্রিল। কারণ মনমোহন সংসদের বাইরে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন, আই পি এল-এ ফোন ট্যাপিং-এর অভিযোগ নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির যে দাবী তোলা হয়েছে তা খারিজ করা হয়েছে। ছটাই প্রস্তাব নিয়ে মায়াবতীকে হাত করে, লালু-মুলায়মকে ভবিষ্যত মন্ত্রীত্বের টোপ দিয়ে ছটাই প্রস্তাবে কোনওক্রমে উতরোলেও সংসদের স্বাধিকারের প্রশ্নে বেশ বেকায়দায় পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কাশ্মীরে জঙ্গিদের জন্য কান্না

কাশ্মীর হইতে যাহারা সেনা-প্রত্যাহারের কথা বলিতেছেন, তাহারা ভাবের ঘরে চুরি করিতেছেন। সম্প্রতি দিল্লীর আদালত তিনজন জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন। ১৯৯৬ সালে দিল্লীর লাজপত নগর বাজারে বোমা বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষের মৃত্যু হইয়াছিল। এই তিনজন জঙ্গি ওই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী বলিয়া আদালতে প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ভারতীয় আইন অনুযায়ী আদালত তাহাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিয়াছেন। আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে সম্প্রতি শ্রীনগর উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল। এবং এই বিক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কারফিউ জারির মতো অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল। এই প্রতিবাদে যাহারা সামিল হইয়াছিলেন তাহারা কেহই নামগোত্রহীন অপরিচিত মুখ নন। চরমপন্থী হিসাবে পরিচিত উপত্যকার বহু নেতাকেই এই প্রতিবাদের পুরোভাগে দেখা গিয়াছে। একের পর এক কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত জঙ্গিদের সমর্থনে আগাইয়া আসিয়াছেন। দিল্লীর বাম-ঘেঁষা সংবাদমাধ্যম ও বুদ্ধিজীবীদের প্রিয়পাত্র তথা আমেরিকান তাত্ত্বিকদের আস্থাভাজন ইয়াসিন মালিককে এই ইস্যুতে পথে নামিতে দেখা গিয়াছে। শুক্রবার নমাজে মীরওয়াইজ ওমর ফারুককে উত্তেজক বক্তৃতা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করিতে হয়। অল পার্টি হুরিয়ত কনফারেন্স-এর চেয়ারম্যান সৈয়দ আলি গিলানি এই রায়কে বিচার বিভাগের পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ বলিয়া দাবী করিয়াছেন। শেষমুহূর্তে শ্রীমতী মেহবুবা মুফতির পীপুলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টিও এই বিক্ষোভে সামিল হইয়াছে এবং আদালতের রায়কে ‘দুর্ভাগ্যজনক’ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

বেশ কয়েক বছর ধরিয়া বিচার বিভাগীয় পদ্ধতি অনুসরণের পর আদালত ঠাণ্ডা মাথার এই খুনীদের যে দণ্ড দিয়াছে, উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি তাহাকেই পক্ষপাতদুষ্ট ও দুর্ভাগ্যজনক বলিয়া প্রতিবাদ-বিক্ষোভে উত্তাল হইয়াছে। জঙ্গিদের সমর্থনে ও আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ এক কথায় অত্যন্ত দুঃখজনক ও পুরোদস্তুর অপরাধ।

শ্রীনগরে গত কয়েকদিন ধরিয়া যে দৃশ্য দেখা গেল, ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকে অপদস্থ করিবার ষড়যন্ত্রের তাহা সূচনা মাত্র। এই তিন খুনী জঙ্গিকে বিচার ব্যবস্থার বলি বলিয়া বিচ্ছিন্নতাবাদীরা প্রতিপন্ন করিতে চায়। ২০০১-এর ১৩ ডিসেম্বর সংসদ ভবন আক্রমণের মূল ষড়যন্ত্রকারী মহম্মদ আফজল গুরু ফাঁসীর আসামী হইয়াও সরকারি বদান্যতায় বহাল তবিয়তেই রহিয়াছে। এই তিন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত খুনী জঙ্গিও ভাবিতেছে আফজলের মতো তাহারাও সুযোগ পাইবে। আমাদের দেশের রাজনৈতিক শাসকেরা এতটাই দুর্বল যে তাহারা এই দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের লইয়া কি করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। অন্যদিকে ওসামা বিন লাদেন যদি কখনও মার্কিন সেনাদের দ্বারা ধৃত বা নিহত হয়, তাহা হইলে উপত্যকার এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী ব্যাপক বিক্ষোভ, শোক মিছিল, সভার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি লইতেছে। শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বে, তাহাদের প্রচেষ্টা স্পষ্টতই অশুভ বা শয়তানের দিকে।

একটি সামান্য স্ফুলিঙ্গ বিশাল অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারে। আজ কাশ্মীর উপত্যকায় যাহা ঘটিতেছে তাহা তুলনামূলকভাবে সামান্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ঘটনা হইল গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি আজ আরও খারাপ। যদিও তার প্রকাশ নিজস্ব পথেই ঘটিতেছে। যাহারা কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছেন, নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রত্যাহারের কথা বলিতেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে যেসব বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জঙ্গিরা রহিয়াছে তাহাদের উপত্যকায় বসতি বা পুনর্বসতি স্থাপনের অনুমতি দেওয়া উচিত বলিয়া ওকালতি করিতেছেন তাহা যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাহাকে কোনও সন্দেহ নেই। সাম্প্রতিক খুনী জঙ্গিদের সমর্থনে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যুক্তিগুলি যদি জেহাদী (ধর্মযোদ্ধা) এবং শিশুসহ নিরীহ মানুষ খুনীদের মধ্যে পার্থক্য করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারের পরিবর্তে বলপ্রয়োগের ভাষাতেই জবাব দিতে হইবে।

ঘটনা হইল এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা জম্মু-কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া ভাবিতেছেন এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছেন। কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারও ওমরের এইসব ভাবনা-চিন্তাকে সমর্থন করিতেছে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া ভারত সরকার অবিচারকে প্রশ্রয় দিয়া চলিয়াছে—এই অভিযোগে হুরিয়ত যদি তাহাদের সৃষ্ট ক্রোধকে বন্দুকের নলের মাধ্যমে উগরাইয়া দিবার চেষ্টা করে, তবে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন কি তাহা মোকাবিলা করিতে পারিবে? সন্ত্রাসবাদের সহানুভূতির স্বার্থে এই সম্ভাব্য ঘটনার পরিণতিটা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমাদের সংস্কৃতির সব প্রাচীন ও প্রাণদায়ী লক্ষণগুলিকে নতুন ভাবে সজীব করে তোলার কাজ আমাদের বর্তমান জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতেই একান্ত জরুরী ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী যা মানুষে মানুষে ভালবাসা ও সম্প্রীতির সত্যিকারের ভিত্তির সন্ধান দেয়, যা সম্পূর্ণ জীবন দর্শনের আধার, যুদ্ধদীর্ণ বর্তমান জগতের সামনে তাকে প্রভাবী রূপে তুলে ধরা দরকার। এই মহান বিশ্ব দৌত্যে সফল হতে হলে আমাদের নিজেদের আগে উপযুক্ত মানের করে তুলতে হবে। অন্যের হুবহু অনুকরণ করার চেয়ে বড় জাতীয় অবমাননা আর কিছু হতে পারে না। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, অন্ধ অনুকরণ মানে প্রগতি নয়। এটা আমাদের আত্মিক পরাধীনতার দিকে নিয়ে যায়।

অবশ্য আমরা বিশ্বাস করি যে, বর্তমান বিপথগামিতা এবং ভুল ধারণাগুলি কেবল একটি ক্ষণস্থায়ী পর্যায়মাত্র। আমাদের সংস্কৃতির মূল অমরত্বের উৎস এত দৃঢ়ভাবে এবং এত গভীরে প্রোথিত যে তা সহজে শুকিয়ে যাওয়ার নয়।

—শ্রী গুরুজী

কোন অপরাধে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের যাযাবর জীবন কাটাতে হচ্ছে?

অসিত বরণ ঠাকুর

১৭ মে ১৯৭৯। সেদিনের তথ্যমন্ত্রী আজকের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বিধানসভায় ঘোষণা করলেন—“মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুশূন্য করা হয়েছে।” রাজ্যের মুখ্যসচিব জানালেন—“মরিচঝাঁপিকে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।” জয়ী হলো জ্যোতির বসুর জেদ ও তার বামফ্রন্ট। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সিপিএম ও তার ক্ষমতার অংশীদাররা। কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ হলো মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর। কিন্তু অকাল মৃত্যু ঘটানো হলো সতীশ মণ্ডল-রাইহরণ বাড়ৈদের “উদ্বাস্তু উন্নয়ণ সমিতি-র” স্বপ্নের, আশা-আকাঙ্ক্ষার, আত্মশক্তির, আত্ম-মর্যাদার ও আত্মপরিচয়ের ‘নেতাজীনগর’ (মরিচঝাঁপি)। হত্যা করা হলো বাংলার নবরূপের নেতাজীকে। মরিচঝাঁপি হলো রিক্ত, নিঃস্ব। বিশ্বাসভঙ্গের বেদনায় উদ্বাস্তুরা বাক্‌রুদ্ধ হলো। ১৩ মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তোলা প্রাণচঞ্চল নতুন দিশার জনপদ হারিয়ে গেল বিস্মৃতির অন্তরালে। উদ্বাস্তু-লাসে সুন্দরবনের বাঘ নরখাদক হয়ে বংশবৃদ্ধি ঘটালো। পুলিশ ও হার্মাদ-সর্দাররা পুরস্কার পেল।

এবারকার ‘নেতাজী হত্যাকারী’ বাঙালী বেশের সাহেব কমরেড জ্যোতি বসু। বাঙালিরা লজ্জায় মাথা নোয়ালো। ছিন্নমূল উদ্বাস্তু নিধনে সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় উঠলো ও বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী উঠলো। বামশরিক দলের নেতা-মন্ত্রীরা মায় সিপিএমের কিছু নেতা পর্যন্ত বিরোধীদের সঙ্গে গলা মেলালো। এতদ্‌সত্বেও দিল্লীর বন্ধু সরকারকে ম্যানেজ করে সব ধামা চাপা দেওয়া গেল।

১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রীত্বে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে এবং বামসমর্থনে কেন্দ্রে মোরারজী দেশাইয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বে জনতা পার্টি ক্ষমতায় এল। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকেই বামেদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি ও আহ্বানে নির্বাসিত, নির্যাতিত ও ক্ষুধাপীড়িত বাঙালি উদ্বাস্তুরা বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠায় হাজারে হাজারে নিজ পরিকল্পনা মতো রুক্ষ দন্ডক (ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশ) ত্যাগ করে সুন্দরবন অঞ্চলে পূনর্বসতির উদ্দেশ্যে পশ্চিমবাংলায় আসতে শুরু করে। জ্যোতি বসু সরকার বাম উদ্বাস্তু-নীতি পরিবর্তন করে দন্ডক ফেরৎ উদ্বাস্তুদের মাঝ রাস্তায় বলপ্রয়োগে ফেরৎ পাঠাতে পারলেও প্রায় ১০ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার (৪০-৪৫ হাজার উদ্বাস্তু) ১৮ এপ্রিল ১৯৭৮ তারিখে বহু অত্যাচার ও ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে মরিচঝাঁপিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

তারা নিজ চেষ্টায় বাইরের কোনও সাহায্য ছাড়াই, রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ার বাইরে থেকে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই “নেতাজীনগর” নামকরণে নতুন জনপদ গড়ে তুলতে সক্ষম হলেও, তারা শেষ রক্ষা করতে পারেনি। জ্যোতি বসুর সরকার ১৪৪ ধারার ঘেরাটোপে অবরোধ করে খাদ্য সামগ্রী বন্ধ করে, হাইকোর্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে, পুলিশ ও দলীয় ক্যাডার দিয়ে উদ্বাস্তুনিধন যজ্ঞ চালিয়ে, অগ্নি সংযোগে সমস্ত উদ্বাস্তু উৎখাৎ করে, ১৭ মে ১৯৭৯ তারিখে ‘নেতাজীনগরকে’ নিশ্চিহ্ন করে।

বাঙালী উদ্বাস্তুরা ১৮ এপ্রিল ১৯৭৮ থেকে ১৭ মে ১৯৭৯ এই সুদীর্ঘ ১৩ মাস প্রাকৃতিক বাধা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, বিশেষ করে ২০ আগস্ট ১৯৭৮ থেকে ১৭ মে ১৯৭৯ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে মধ্যযুগীয় নৃশংসতাকে উপেক্ষা করে যে মনোবল ও দৃঢ়প্রত্যয় দেখিয়ে জীবন সংগ্রাম করে আত্মবলিদান দিয়েছে তা ইতিহাসে বিরল। রাষ্ট্র ক্ষমতা অপব্যবহার করে ছলে-বলে-কৌশলে, অর্থনৈতিক অবরোধ করে অগ্নি সংযোগে তাদের নারকীয়ভাবে গণহত্যা করে উৎখাত করা হয়েছে। তারা আত্মসমর্পণ না করে আত্মবলিদান দিয়েছে। তাদের এই আত্মত্যাগী জীবনসংগ্রামকে কখনোই পরাজয় বলে কলঙ্কিত করা যাবে না। বরং তাদের এই অসম যুদ্ধের আত্মত্যাগীদের শহীদের মর্যাদা ও জীবিতদের বীরের সম্মান দিতে হবে এবং ফ্যাসিস্ট জ্যোতি বসুর এই কাপুরুষোচিত কাজকে ঘৃণা জানাতে হবে।

দন্ডক-উদ্বাস্তু আগমন, উচ্ছেদ ও বহির্গমনে কত জীবনহানি ও ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার সঠিক হিসাব হয়নি, ৩২ বছর পর তা সম্ভবও নয়। তবে বহু লেখক ও গবেষক একমত হয়ে বলেছেন যে প্রায় ৪১২৫ উদ্বাস্তু পরিবার অর্থাৎ ১৭ হাজার উদ্বাস্তু আর দন্ডকে ফিরে যায়নি। (সূত্র-মধুময় পাল সম্পাদিত মরিচঝাঁপি-ছিন্নদেশে, ছিন্ন ইতিহাস)। এর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য প্রান্তে চলে গিয়ে বাঁচার শেষ চেষ্টা করছে। অনাহারে, অর্ধাহারে, রোগভোগে ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে মৃত্যুর সংখ্যা (মরিচঝাঁপির গণহত্যা সহ) বেশ কয়েক হাজার হবে। যাঁরা এককালে কৃষি উপযোগী আন্দামান সহ বাংলার বাইরে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বাধা দিয়ে উদ্বাস্তুদের বাংলায় পুনর্বাসন চেয়েছিল তারা এই মর্মান্তিক পরিণতির জন্য অবশ্যই দায়ী।

ভারত ভাগের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের বাম রাজনীতিবিদ্‌রা যে শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার ও গণহত্যা করে প্রতারণা করলো তা তাদের এক কলঙ্কময় ইতিহাস। সরকারি সাহায্য ছাড়াই নিজ চেষ্টায় বাঁচতে চেয়েও তাদের মরতে হলো। এর চাইতে দুঃখের ও বেদনার আর কিছু হয় না। বাঙালি জাতির এ এক আত্মঘাতী কাজ যা লজ্জার ও কলঙ্কের। যারা জীবনে বেঁচে আছে পশ্চিমবঙ্গে বা অন্যত্র, তাদের প্রতি বাঙালিদের দায়বদ্ধতা আছে। তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনে আমাদের এগিয়ে আসা উচিত। বাঙালি উদ্বাস্তুদের উপর ধারাবাহিক রাষ্ট্রীয় অত্যাচার, বঞ্চনা, বৈষম্য, গণহত্যা ও প্রতারণার প্রতিকার চেয়ে এই অন্যায় ও অমানবিক ব্যবহার চিরতরে বন্ধ করা দরকার।

দন্ডকে নির্বাসিত ও নির্যাতিত বাঙালি উদ্বাস্তু সমস্যা, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু গণহত্যা, সারা দেশে ২ কোটিরও বেশি রাষ্ট্রীয় পরিচয়হীন নির্যাতিত ও বঞ্চিত বাঙালী উদ্বাস্তুর সমস্যা স্বাধীনতার ৬৩ বছর পরেও কেন সমাধান হচ্ছে না তার উত্তর খুঁজতে কেউ কেউ জাতপাতের বৈষম্যকে দায়ী করেছেন। উচ্চবর্গীয়রা আগেই এদেশে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাই তাদের মাথাব্যথা নেই। তবে এটা সত্য যে ভূমি ও কৃষি নির্ভর হিন্দুদের, অন্য পেশার মানুষদের মতোন, ওপার বাংলা থেকে ভিটে-মাটি ছেড়ে প্রথমেই আসতে পারেনি প্রধানত সাহস, দূরদর্শিতা, একতা ও সঠিক নেতৃত্বের অভাবে।

বাঙালি উদ্বাস্তু সমস্যার এই পরিণতির জন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এই সমস্যার পেছনে সেই পুরাতন বাঙালি বিদ্বেষ কাজ করেছে। বাঙালি বৈরীতার সূত্রপাত হয়েছিল প্রাক্‌স্বাধীনতার যুগে (সম্ভবত ১৯১৯ সালের পর থেকে) সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও তাদের তাঁবেদার বেনিয়াদের দ্বৈত স্বার্থে। এই স্বার্থে চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে ক্রমান্বয়ে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে অপমানিত হয়ে সরে যেতে হয়েছিল গান্ধী বিরোধিতার অজুহাতে। ওই একই স্বার্থে দুই মৌলবাদী শক্তিকে মদত দিয়ে নেহেরুর বন্ধু লর্ড মাউন্টব্যাটেন কমিউনিস্ট সমর্থনে ভারত ভাগ করেছে। সঠিক বিচার না করেই বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ

> “উদ্বাস্তু গণহত্যার মহানায়ক জ্যোতি বসু তার জীবদ্দশায় একবারও দুঃখ প্রকাশ বা (মা চাননি। সমস্যা জর্জরিত বুদ্ধবাবু ভুল স্বীকার করে অন্তত একবার (মা চেয়ে পাপের ভাগ কিছুটা লঘু ক(েন এবং তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত হওয়া উদ্বাস্তু সমেত পথে-ঘাটে পড়ে থাকা সমস্ত বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব সহ বাংলায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে রাজনৈতিক বি(্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনুন।”

(এরপর ৪ পাতায়)

সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ইঙ্গিত ?

(১ পাতার পর)

ও সংঘাতের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকলেও, দলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিয়ে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরির রাস্তা প্রশস্ত অবশ্যই হবে, সে লক্ষেই অবিচল থাকতে হবে। দলের নেতৃত্বকে খুশি করতে নিজের সুবিধা ও লাভের বিনিময়ে বিবেক, দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থ বিসর্জন দিতে বাধা কোথায়?

সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহায্যে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি, এবং তাদের ভোট পাওয়ার লালসায় সব রাজনৈতিক দলই উদগ্রীব। এই প্রতিযোগিতায় রাজ্য সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো কোমর বেঁধে নেমেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের জন্য চার শতাংশ পদ সংরক্ষণ লাগু করতে গিয়ে হোচট খেয়েছে। রাজ্যের হাইকোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ অসাংবিধানিক বলে নাকচ করে দিয়েছে। রাজ্য সরকার এখন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামদলগুলি, বিশেষ করে সিপিএম, সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মন জয় করে নির্বাচনে সাফল্য লাভ করে আসছিল। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য লাগামহীন আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ২৫ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোটারদের সমর্থন আদায় করে আসছিল। কিন্তু রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে প্রকাশ পেয়েছে, সংখ্যালঘুরা বামদলগুলি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। সমর্থন আদায়ের অপকৌশল সংখ্যালঘুরা এখন খুব ভাল করেই বুঝতে পেরেছে। বুদ্ধ দেববাবু ও আলিমুদ্দিন স্ট্রীট আসন্ন পৌরসভা ও ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কালো মেঘ বেশ ভাল করেই অনুভব করছেন। পরিবর্তনের আবহাওয়া ও সংখ্যালঘুদের বিমুখতা যে পার্টির ভরাডুবির অনিবার্য কারণ হয়ে উঠবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

সুতরাং সংখ্যালঘুদের সমর্থন ফিরিয়ে আনতে চমকদার একটা কিছু করা দরকার। কাজেই মুখ্যমন্ত্রী গত ৮ ফেব্রুয়ারী হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে, রাজ্যে সরকারী চাকুরীতে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ করা হবে এবং রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতেই উপরোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উল্লেখযোগ্য, রঙ্গ নাথ মিশ্র কমিশনের রিপোর্ট সরকারীভাবে বিধানসভায় পেশ করা হয়নি। এ নিয়ে মাননীয় সাংসদ বা বিধায়কগণ কোনও আলোচনায় অংশ নেননি এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেননি। জনগণ রিপোর্টের সুপারিশ ও বক্তব্য ইত্যাদি নিয়ে এখনও অন্ধকারে। কোনও রাজ্যের বিধানসভায় রিপোর্টটি এখনও পেশ হয়নি এবং আলোচিত হয়নি। মাননীয় বিধায়কদের মন্তব্য ও মতামতের কোনও সুযোগ এখনও দেওয়া হয়নি। তথাপি মুখ্যমন্ত্রী সব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি উপেক্ষা করে রিপোর্টের সুপারিশ কার্যকরী করতে পদক্ষেপ নিয়েছেন।

গত ৩৩ বছর সিপিএম-র নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেনি। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণে রাজ্য সরকার ছিল উদাসীন। প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ও মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তাদের সমর্থন ও ভোট পেয়ে সিপিএম রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় বাজিমাত করেছে। মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ, কুসংস্কার, অশিক্ষা ও দারিদ্র দূর করতে কোন চেষ্টাই করা হয়নি। তবে আজকে কেন মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নভঙ্গ হলো? শুধু চাকুরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে সব দায় দায়িত্ব শেষ করতে অগ্রণী হলেন? যে কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ যদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা না পায় এবং জনসেবায় ও সরকারী কর্তব্য পালনে উপযুক্ত অথবা দক্ষ না হয়, সেক্ষেত্রে তার পক্ষে সরকারী কর্তব্য পালন ও জনতার স্বার্থরক্ষা করা কোনও মতেই সম্ভব নয়। অতএব, মুখ্যমন্ত্রী সমস্যার মূলে না গিয়ে, শুধু চমকের সাহায্যে বাজিমাত করতে মাঠে নেমেছেন। তিনি মনে করেন, এতে সংখ্যালঘু মুসলমানরা তুষ্ট হয়ে সি পি এম মার্কা ভোট বাক্সে বাণ্ডিল বাণ্ডিল ভোট ফেলে সিপিএম প্রার্থীদের জয় নিশ্চিত করে তুলবে। যাইহোক, আসন্ন পুরসভার ও বিধানসভার নির্বাচন সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য প্রণোদিত ঘোষণা নিরপেক্ষ জনগণকে হতাশ করেছে। তারা মুখ্যমন্ত্রীর তথাকথিত প্রগতিশীল পদক্ষেপকে শুধু ব্যঙ্গ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা এর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদের আওয়াজ তুলেছে।

মুসলমান সমাজ যে শিক্ষা-দীক্ষায় ও অগ্রগতিতে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, এ সত্য সকলের জানা আছে। তাদের সমাজে সংস্কার আনতে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলির কোনও মাথাব্যথা নেই। তারা চাকুরীতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে 'ড্রপ্তপ্তগুপ্তক্ষ' ত্রন্তক্ষ' হিসাবে সংখ্যালঘুদের ভোট পেতে সচেষ্ট। স্মরণ করা যেতে পারে, তুরস্কের রাষ্ট্রনায়ক কামাল আতার্তুক মুসলিম সমাজে আমূল সংস্কার সাধন করেছিলেন। ফলে অন্ধ কুসংস্কার ছেড়ে তুরস্ক আজকে পশ্চিমের প্রগতিশীল দেশগুলির মধ্যে অন্যতম একটি দেশ। কামালের সাফল্য দেখে, বিদ্রোহী কবি নজরুল লিখেছিলেন, "কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।" সুতরাং সংখ্যালঘুদের ভোট ব্যাঙ্কের ঘুটি হিসাবে ব্যবহার না করে তাদের অগ্রগতি ও সমাজ সংস্কারের জন্য সকলের সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

সংরক্ষণের ফলে ৭৫ শতাংশ ভারতীয়দের অন্তরে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেটা মুখ্যমন্ত্রীর উপলব্ধি করা উচিত। সংখ্যাগুরুরা যে ভোটার এবং ভোট যুদ্ধে জয়ের জন্য তাদের ভোট পাওয়াও যে অপরিহার্য সেটা মুখ্যমন্ত্রীর বোঝা উচিত। অবশ্য তিনি যদি মনে করে থাকেন, সংখ্যাগুরুরা, "ভেড়ার পাল" মুখ্যমন্ত্রীর অসাংবিধানিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া হবে না, সেক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ও নিরপেক্ষ নাগরিকদের কিছু বলার নেই। সংরক্ষণ যে সমাজ ও সম্প্রদায় বিভেদ সৃষ্টি করবে এবং দ্বন্দ্ব ঘোরতর করে তুলবে এতে কোন সংশয় নেই। ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগের ড্ডগ্গজ্বস্তদ্বক্ষ ট্রন্তক্ষগ্গক্ষ এবং ১৯৪৭ সালে দাঙ্গা ও দেশে বিভাগের পুনরাবৃত্তির শিলান্যাস হলো, এতে কোনও দ্বিমত নেই। সে সময়ে দেশনেতাদের ভুলের জন্যই দেশভাগ হয়েছিল। পাঞ্জাব ও বাংলার কয়েক কোটি মানুষ এ অন্যায় ও অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। তথাপি ইতিহাস থেকেও দেশের অপদার্থ নেতাগণ শিক্ষা গ্রহণ করেনি। আজকে তারা ক্ষমতার লোভে সেই ভুলই করে চলেছে। কাজেই জনগণকে সক্রিয় হয়ে, নেতাদের জাতি ও দেশ বিরোধী পদক্ষেপকে বানচাল করতে অগ্রণী হতে হবে।

উদ্বাস্তুদের যাযাবর জীবন

(৩ পাতার পর)

করে জ্ঞানবুদ্ধি সমৃদ্ধ বাঙালি জাতি এবং সাহস ও শৌর্যবীর্যে শক্তিশালী পাঞ্জাবী জাতিকে ধ্বংস করার চক্রান্ত হয়েছে। পাঞ্জাবীরা রক্তপাতের মাধ্যমে লোক বিনিময় করে কেন্দ্রের বদান্যতায় দেশভাগের ক্ষত কিছুটা প্রশমিত করতে পারলেও বাঙালিরা চরম অনৈক্য, কমিউনিস্টদের সুবিধাবাদী রাজনীতি ও উপযুক্ত নেতৃত্বহীনতার কারণে এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও বৈষম্যের ফলে আজও ওপারের বাঙালিরা উদ্বাস্তু রয়ে গিয়ে পথে-ঘাটে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হচ্ছে।

বাঙালি বিদ্বেষের কারণে কেবলমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের জন্য (বাঙালিদের বঞ্চিত করে) চারটি বিশেষ কেন্দ্রীয় আইন পাশ করে সার্বিক পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের 'রিফিউজি' না বলে 'ডিসপ্লেসড পার্সনে' আখ্যায়িত করে, পূর্ব পাকিস্তানে বারে বারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পাঠিয়ে উদ্বাস্তু আসায় বাধা দিয়ে, পাসপোর্ট-ভিসা ও মাইগ্রেশন না দিয়ে বা বিলম্বিত করে, পুনর্বাসন না দিয়ে পি. এল. ক্যাম্প করে ডোল খাইয়ে পরিচয়ে মারার চক্রান্ত করে শেষ পর্যন্ত বাংলায় কিছু সংখ্যককে পুনর্বাসন দিয়ে বাকীদের বাংলার বাইরে পুনর্বাসনের নামে নির্বাসনে পাঠায়। দণ্ডকারণ্য এরকম একটি চাষ-বাস অযোগ্য পাথর-জঙ্গলে পরিপূর্ণ বিপদসঙ্কুল জায়গা। সেখানে সরকারী অবহেলায় পুনর্বাসনের কোন পরিকাঠামোই তৈরি করা হয়নি আজও। বাঙালি উদ্বাস্তুরা বেনাগরিক হয়ে পুনর্বাসনের অপেক্ষায় পথে ঘাটে, রেলের পাশে, নালা বা আবর্জনা স্তূপের মধ্যে মানবেতর জীবনে বাধ্য হচ্ছে। বাঙালি উদ্বাস্তু সমস্যা আজ এক 'জ্বলন্ত জাতীয় মানবিক সমস্যা'। তার সমাধানের চেষ্টা আজও হচ্ছে না।

উদ্বাস্তু স্বার্থ বিরোধী ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন পাশ হওয়ার সময় কোনও বাঙালি সাংসদ বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার সংস্থান রাখার ডঃ মনমোহন সিং ও প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ শঙ্কর রায়চৌধুরীর রাজ্যসভায় ১৮-১২-২০০৩ তারিখের দাবীকে সমর্থন করেনি। ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর পরে আসা বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেই, ২০০৪ সালের নাগরিকত্ব (সংশোধন বিধি) চালু হলো গুজরাট ও রাজস্থানে আগত পশ্চিম পাকিস্তানি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য। ওই বিধি অমানবিক, বৈষম্যমূলক ও সংবিধান বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ বা বাঙালি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত কোনও রাজ্য সরকার বা বাঙালি সাংসদরা আজও প্রতিবাদ করেনি। বাঙালি উদ্বাস্তুদের প্রতি এই অবিচার, বঞ্চনা ও বৈষম্য আর কতদিন চলবে?

জ্যোতি বসুরা ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখল ও পরে উদ্বাস্তু বিরোধী নীতি গ্রহণ করে নারকীয় ভাবে উদ্বাস্তু নিধন ও বিতাড়নের পিছনে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও প্রতারণা সুস্পষ্ট।

কিন্তু এর পেছনে বাঙালী বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষীদের এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষীদের হাত ছিল কি না তাও ভেবে দেখা দরকার। জ্যোতি বসুর শিক্ষা ও রাজনৈতিক দীক্ষা বিলেতে। ঘটনাচক্রে ভারত ভাগের নায়করাও (জিন্না, গান্ধী-নেহেরু এবং কমিউনিস্টরা) ইংরেজ স্বার্থরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

উদ্বাস্তু গণহত্যার মহানায়ক জ্যোতি বসু তার জীবদ্দশায় একবারও দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা চাননি। সমস্যা জর্জরিত বুদ্ধ বাবু ভুল স্বীকার করে অন্তত একবার ক্ষমা চেয়ে পাপের ভাগ কিছুটা লঘু করুন এবং তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে মরিচঝাঁপি থেকে উৎখাত হওয়া উদ্বাস্তু সমেত পথে-ঘাটে পড়ে থাকা সমস্ত বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব সহ বাংলায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনুন।

ইতিমধ্যে মরিচঝাঁপি গণহত্যার তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টে ১৯৯৫ সালে এক রিট মামলায় রেল লাইনের দুপাশ থেকে উদ্বাস্তু উচ্ছেদের উপর নিষেধাজ্ঞা বিরুদ্ধে রুল ইস্যু হয়েছে। তদ্বিরের অভাবে মামলাগুলি এগোচ্ছে না। আমাদের উচিত সেই সমস্ত মামলার সুষ্ঠু বিচারে সহায়তা করা।

সর্বহারাদের নামে যারা রাজনীতি করেন বা যারা দলিত রাজনীতি করেন তারা নিশ্চুপ কেন? কেন্দ্রে ক্ষমতাশীল কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস এই মানবিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসুন, বিশেষ করে তারা যখন আগামী দিনের পশ্চিমবাংলার ক্ষমতা দখলে বদ্ধ পরিকর। মরিচঝাঁপির 'নেতাজী' হত্যায় নেতাজীর 'ফরওয়ার্ড ব্লক' আজও কেন নেতাজী হত্যাকারীদের বিচার ও শাস্তি চাইছে না বা নেতাজীর আত্মশক্তিতে বলীয়ানদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না? আসল 'নেতাজী'র অন্তর্ধান-রহস্যে নিয়োজিত তদন্ত কমিশন আজও বলতে পারলো না নেতাজী 'জীবিত' না 'মৃত'। তাই তার 'শ্রাদ্ধ-শান্তি' হবে না। 'শ্রাদ্ধ-শান্তি' হলে তো সব শেষ। এই নেতাজীর আত্মশক্তিধররা অমৃতের ভাগ না পেয়েও অমর, অজেয়। তাই তাদের পুনরাবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী।

যে 'স্বাধীনতা' উদ্বাস্তু জন্ম দেয় সে "আজাদি ঝুটা হ্যায়"। যাদের পূর্বপুরুষের জন্ম-ভিটা-মাটির বিনিময়ের স্বাধীনতায় ভাগিদারী স্বীকৃত নেই সেই 'স্বাধীনতা' কি তাদের দরকার আছে?

চার্চ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ক্যাথলিক খৃস্টানরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কথা রেখেছেন রোমান ক্যাথলিক খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু পোপ। তৃতীয় সহস্রাব্দে ভারত সহ এশিয়াকে খৃস্টান করার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন বর্তমান পোপ বেনেডিক্ট-এর পূর্বসূরী পোপ জন পল-২ নিজেই। ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের হাতে বেশ কয়েকবছর ধরে যৌন কেলেঙ্কারি, বিশেষত নাবালক ও নাবালিকাদের যৌন উৎপীড়নের ঘটনা আকছার ঘটছে এবং ঘটে চলেছে। যে কারণে খোদ পোপকে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হয়েছে। তবুও এশিয়া এবং আফ্রিকায় খৃস্টান করার কাজে খামতি পড়েনি।

২০০০—২০০৮ সালের মধ্যে সারা বিশ্বের জনসংখ্যা ১.১৬৬ বিলিয়ান, তার মধ্যে ক্যাথলিক খৃস্টানদের সংখ্যাই ১১.৫ শতাংশ। প্রসঙ্গত, রোমান ক্যাথলিক ছাড়াও খৃস্টানদের আরও অনেক সম্প্রদায় রয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বেই ক্যাথলিক খৃস্টানদের সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এশিয়াতে ১৫.৬ শতাংশ এবং আফ্রিকাতে ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। খৃস্ট ধর্মপ্রচারক এবং ধর্মান্তরকরণে সক্রিয় খৃস্ট ধর্মযাজকদের সংখ্যাও এশিয়া এবং আফ্রিকাতে ভালোই বৃদ্ধি পেয়েছে। এশিয়াতে ২৪ শতাংশ এবং আফ্রিকাতে ৩৩ শতাংশ।

ভ্যাটিকান অতি সম্প্রতি পরিসংখ্যানগত যে ইয়ারবুক প্রকাশ করেছে তা থেকেই এই খবর পাওয়া গেছে। সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ তথ্য হলো, একই সময়ে ইউরোপে ক্যাথলিক সংখ্যাবৃদ্ধির হার নামমাত্র। অনুমান বা সম্ভাব্য সংখ্যার ধারেপাশে নেই। আমেরিকা, জার্মানী, আয়ারল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইতালিতে ব্যাপকহারে যৌন উৎপীড়নের কারণে মানুষ চার্চ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। ইউরোপে ২০০০ থেকে ২০০৮-এর মধ্যে ক্যাথলিক খৃস্টান সংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র ১.১৭ শতাংশ। প্রায় স্থিতাবস্থা বজায় চলে।

সুন্দরবনেও মাওবাদী কমিটি

(১ পাতার পর)

অন্যদের কাছ থেকেও সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট।"

গোয়েন্দা তথ্য অনুসারে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় 'আদিবাসী জনসাধারণ বিকাশ কমিটি' নামে এক কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রকাশ্যে এই কমিটির নাম যাই থাক না কেন, এটি আদতে লালগড়ের 'পুলিশী সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির'ই প্রতিরূপ। ডায়মণ্ডহারবারসহ কয়েকটি এলাকাকে গোয়েন্দারা চিহ্নিত করেছেন। সেখানে মাওবাদীদের গতিবিধির সন্ধান পাওয়া গেছে।

রাজ্য পুলিশের ডি জি ভূপিন্দর সিং এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, মাওবাদীদের কার্যকলাপ রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে মাওবাদীরা যে জঙ্গলমহল থেকে অন্যত্র তাদের ভিত্তি তৈরি করছে এটা প্রকৃত ঘটনা। শ্রী সিং আরও বলেছেন, উত্তরবঙ্গেও মাওবাদীরা চা-বাগান এলাকায় পা-রাখার চেষ্টা করছে। এখবর পুলিশের কাছে রয়েছে।

পুলিশের কথায়, নবগঠিত কমিটি সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় গোপন-বৈঠক করছে। কিছু দ্বীপে তারা সরকার বিরোধী পোস্টারও দিয়েছে। তবে, কে বা কারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তা এখনও জানা যায়নি। একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের কথায়, জঙ্গলমহলের মতোই মাওবাদীরা তুলনামূলকভাবে অনুন্নত এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। সুন্দরবনের বিশাল এলাকা অনুন্নত এবং ওখানকার অধিবাসীরা খুবই গরীব। অনেক এলাকা দুর্গমও বটে। ফলে তা মাওবাদীদের আত্মগোপন করে থাকার পক্ষে আদর্শ।

পুলিশী সূত্রমতে, মাওবাদীরা পশ্চিম-মেদিনীপুর, পূর্ব-মেদিনীপুর থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন এলাকায় এক করিডর গড়ে তুলতে চায়। এবং ওখান থেকে তারা সহজে বাংলাদেশেও যেতে-আসতে পারে। সুন্দরবন থেকে অনায়াসেই বাংলাদেশে ঢুকে পড়া যায়। এই সব এলাকায় যাতায়াতের জন্য নিরাপদ করিডর গড়ে তুলতেই মাওবাদীরা আগ্রহী।

রাজ্য রাজনীতি

পুরনির্বাচনের পরই বিপন্ন হবে বামফ্রন্টের অস্তিত্ব

নিশাকর সোম

ক্ষমতার লিপ্সা এমন এক বস্তু যা আমাদের দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে সুপ্ত লোভ-লালসা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জেগে ওঠে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় যখন সঠিক রোগ নির্ধারণ করা যায় না, তখন একডোজ সালফার দিলেই সব রোগ ফুটে ওঠে। যখন ক্ষমতালোভী ব্যক্তি দেখেন সমষ্টি তাঁর ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে, অনেক সময়ে হয়তো বা অন্যায়ভাবে তখন বাক্যবাণের ছটায় সমষ্টিকে বিদ্ধ করে নিজেকে 'নিষ্কলঙ্ক' প্রমাণ করার চেষ্টা করে। ক্ষমতা যে অতি বিষম বস্তু। তা প্রমাণ হয়ে গেল পৌর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে।

রাজ্যের প্রধান শাসক দলের মধ্যে ক্ষমতা কাড়ার সালফার প্রয়োগ হতেই রোগীর রোগ ফুটে উঠেছে। কলকাতার বিদায়ী মেয়র (পার্টটাইম?) বলছেন, "রাজনৈতিক বাধায় (পার্টির) অনেক কাজ করা যায়নি। রাজনৈতিক স্বার্থে নন্দরাম মার্কেট ভাঙা যায়নি। রাস্তার পার্কিং ফি আদায়ের ক্ষেত্রে মাফিয়া রাজ চলছে। কলকাতা জেলা পার্টির কিছু নেতা (প্রশান্ত চ্যাটার্জি) তাঁকে কাজ করতে দেননি (দিলীপ সেন?)।" বিকাশ ভট্টাচার্যকে কলকাতার মেয়র করা হয় রাজ্য নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে। কারণ, তখন কলকাতার মেয়র পদের লড়াই-এর দ্বৈরথে ছিলেন কান্তি গাঙ্গুলি ও দিলীপ সেন।

রাজ্য সিপিএম নেতৃত্ব তাই বিকাশ ভট্টাচার্যকেই মেয়রপদে বসিয়ে দেন। বিকাশবাবু পার্টিকে বলেন, তিনি পার্টটাইম কাজ করবেন। কারণ তাঁর আইনের ব্যবসা ছাড়তে পারবেন না। এখন অবশ্য তর্জন-গর্জন করে আষাঢ়ের মেঘের মতো বিকাশবাবু চুপ করে গেলেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যায়, কলকাতা পুরসভা বামফ্রন্টের হাতছাড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিপিএম-এর কলকাতা জেলা পার্টির নেতাদের বিসর্জনের বাজনা বাজবে। এখনই পার্টিকর্মীরা বলছেন, "...থাকবে কতক্ষণ—যাবে বিসর্জন।" যেসব ওয়ার্ডে প্রার্থী পরিবর্তন হয়েছে সেখানেই পূর্বতন কাউন্সিলার নতুনকে পরাজিত করার জন্য উঠে পড়ে লাগবেন। এর উপর আছে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর প্রার্থীকে পরাজিত করে নিজ গোষ্ঠীর প্রাধান্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হবে।

এবার আসা যাক উত্তর ২৪ পরগণার বিধাননগর পৌর নির্বাচন সম্পর্কে। বিদায়ী চেয়ারম্যান বিশ্বজীবন মজুমদার এখন বলছেন, "বেআইনি বাড়ি তৈরির মঞ্জুরী দেবার জন্য তাঁকে চাপ দেওয়া হয়েছিল। বহু 'অনৈতিক' কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।" এ-সব কথা কিন্তু চেয়ারম্যান থাকাকালীন তিনি বলেননি কেন? পদচ্যুতির ভয়ে? ক্ষমতার আঠা এমনই বস্তু! বিশ্বজীবনবাবু যখন চেয়ারম্যান হন, তখন তিনি পার্টি-সদস্য ছিলেন না। জ্যোতি বসুর 'আদেশে' পার্টি-সদস্য হন। তিনিই আবার বলেছেন, "আমাকে দিয়ে বেআইনি কাজ করানোর জন্য চাপ দেওয়া হোত।" জ্যোতি বসুর নির্দেশ বলে চালানো হোত।

বিশ্বজীবনবাবু বরাবরই একরোখা ছিলেন। তাঁর এক অগ্রজ ক্যাপ্টেন ডঃ কৃষ্ণজীবন মজুমদার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে কাশীপুর থেকে কাউন্সিলার হন। যা হোক, সুভাষ গোষ্ঠীর প্রার্থী তাঁর শ্যালক নন্দ ভট্টাচার্য এবং অভিতাভ গোষ্ঠীর প্রার্থী তাঁর জায়া ইলা নন্দীদের চেয়ারম্যান হতে না-দেবার জন্য দিলীপ গুপ্ত বিশ্বজীবনকে তাঁর ওয়ার্ডে দাঁড়-করিয়ে চেয়ারম্যানের দিকে এগিয়ে দেন।

এখন বিশ্বজীবনবাবু বলছেন, তিনি সুভাষ চক্রবর্তীর গোষ্ঠীর লোক বলেই অমিতাভ নন্দীরা হেনস্থা করলেন। একটা কথার জবাব দিন বিশ্বজীবনবাবু—সুভাষ চক্রবর্তীর বাড়িটাতো 'গিফট'—একজন প্রমোটার নাকি দিয়েছিলেন? এটা কি পন্থা? বিশ্বজীবন ডিগবাজি খেয়ে মুখ বন্ধ করলেন। পার্টির হয়ে প্রচারে নামলেন। পার্টির রাজ্য-নেতৃত্ব তাঁকে বিভিন্ন পদের পারিতোষিক দেবার প্রস্তাব দিয়েছেন। কলকাতা পুরসভা এবং বিধাননগর পুরসভা সিপিএম-এর হাতছাড়া হতে চলেছে? কারণ সর্বত্রই কর্মীদের প্রচণ্ড নিষ্ক্রিয়তা।

কলকাতার বিদায়ী মেয়র (পার্টটাইম?) বলছেন, "রাজনৈতিক বাধায় (পার্টির) অনেক কাজ করা যায়নি। রাজনৈতিক স্বার্থে নন্দরাম মার্কেটে ভাঙা যায়নি। রাস্তার পার্কিং ফি আদায়ের ক্ষেত্রে মাফিয়া রাজ চলছে। কলকাতা জেলা পার্টির কিছু নেতা (প্রশান্ত চ্যাটার্জি) তাঁকে কাজ করতে দেননি (দিলীপ সেন?)।"

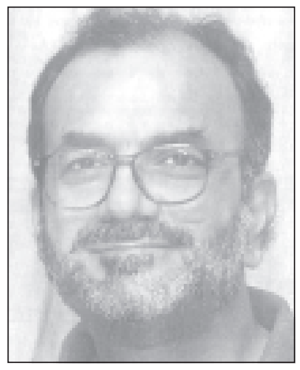

এদিকে পৌর-নির্বাচনের প্রাক্কালে আর এস পি পরিচালিত শ্রমিক সংগঠনের সম্মেলনে রাজ্যের মন্ত্রী তথা আর এস পি-নেতা ক্ষিতি গোস্বামী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন—"রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী হাতজোড় করে মালিকদের কাছে কথা বলেন—শ্রমিকরা মারা যাচ্ছে। বিধানসভায় শ্রমমন্ত্রীর কথা শোনা যায় না। দেখে শুনে মনে হয় রাজ্যে কোনও শ্রমমন্ত্রী বা শ্রমদপ্তর নেই। এই মন্ত্রী গরীবদের স্বার্থরক্ষা করছে না, শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করছেনা, বেকারদের চাক্‌রি দিতে পারছে না। কাজেই শ্রমিক-গরীবরাও এই সরকার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এ-দিকে কিছু মন্ত্রী বুক-ফুলিয়ে কিছু পরিসংখ্যান দিয়ে যাচ্ছেন। ওইসব মন্ত্রীদের বুকে লাথি মারুন। মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে যাক।" এই হলো আর এস পি-এর বক্তব্য।

শুধু আর এস পি নয়, ফরওয়ার্ড ব্লক ও সি পি আই-ও এই মনোভাব পোষণ করে। ফলে পুর নির্বাচনের পর বামফ্রন্টের অস্তিত্ব থাকবে কিনা সেটা একটা বিরাট প্রশ্ন। কারণ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এইসব পার্টি টি এম সি-এর সাথে গোপন 'মউ' করতে পারে।

এবার দেখা যাক রাজ্যের প্রধান বিরোধী শিবিরের অবস্থা। বস্তুত রাজ্যের কংগ্রেস দল একটি ঢোঁড়া-সাপ। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি- কংগ্রেসী সাংসদ দীপা দাশমুন্সি (প্রিয়রঞ্জন-জায়া) সম্পর্কে বলেছেন—"কপালে বড় টিপ লাগিয়ে দিনে বার বার বেনারসী শাড়ি পাল্টিয়ে, দুটো স্বামী পাল্টিয়ে মমতার সমান হওয়া যায় না।" বলাবাহুল্য, কংগ্রেসের কোনও ওজনদারি নেতা এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেননি। কারণটা হলো—রাজ্য কংগ্রেসকে তৃণমূলের লেজুড়-এ পরিণত করেছেন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

পৌর নির্বাচনে তৃণমূলের হুকুমেই কংগ্রেস-কে চলতে হবে এ-নির্দেশ সোনিয়া গান্ধীর। কারণটা খুবই স্পষ্ট—ইউ পি এ সরকার রাজনৈতিক, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-মূল্যবৃদ্ধি সমস্ত বিষয়ে ব্যর্থ। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র নেতৃত্বে নবরূপে এন ডি এ-এর উত্থান নিয়ে সোনিয়া চিন্তিত। এমতাবস্থায় মমতাকে তোষামোদ করা ছাড়া সোনিয়া প্রণবের আর কোনও পথ নেই। পৌর নির্বাচন থেকে শুরু করে আগামী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত রাজ্য কংগ্রেসের ভাঙন অব্যাহত থাকবে। সুব্রত মুখার্জি তো তৃণমূলে যোগ দেবেন—মেয়র করার প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগেই রাজ্য-কংগ্রেসকে কঙ্কালসার করার পরিকল্পনা এঁটেছেন মমতা ব্যানার্জি। তাঁকে অকুণ্ঠভাবে সহায়তা করছেন একদা মমতা-বিরোধী, তৃণমূল পার্টি তৈরির কারণ সোমেন মিত্র। তিনি স্ত্রী-পুত্র পরিজন স্বজন নিয়ে তৃণমূলে চলে গেছেন। পাঁচ বছর সাংসদ থাকলে পেনসন-টা মোটা হবে। তাতে বাকি জীবনটা চলে যাবে। এছাড়া সাংসদ পদের দৌলতে তো মাসে লক্ষাধিক টাকা আয়। সাবাস! ছোড়দা। আর রাজ্য-কংগ্রেস-কে কলকাতায় ২০টা সীট নিয়েই কি বসে যেতে হবে? আগামী দিনে রাজ্য-সিপিএম এবং রাজ্য-কংগ্রেসের সামনে ঘোর সঙ্কট আসছে।

অ ঢ রকম

তাকিন একটা প্রাণীর নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যে প্রাণীটাকে আপনি কখনও দেখেননি। ইয়েতির মতোই যার উপস্থিতি অশরীরি। কিন্তু ইয়েতির সঙ্গে এর তফাতটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইয়েতি নিয়ে আলো-আঁধারির যে রোম্যান্টিসিজিমটা কাজ করে তাকিনের বেলায় তা অদৃশ্য। তবে রূপকল্পনায় মনুষ্যজাতির জুড়ি মেলা ভার। সেই কারণেই তাকিন কখনও পৌরাণিক জন্তু, কখনও বা তার আবির্ভাব স্বর্গীয় প্রাণী হিসেবে।

ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের কাছে সেভাবে পরিচিত নয়, কিন্তু আমাদেরই দেশের উত্তর-পূর্বে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে একে ঘিরে বহু কাহিনী প্রচলিত রয়েছে।

এমনই এক প্রচলিত কাহিনী হলো জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী লামা দ্রুকপা কুনলে ভুটানের একটি পাহাড়ী গ্রামে যোগবলে ছাগলের মাথা আর গরুর হাড় দিয়ে একটি স্বর্গীয় প্রাণী তৈরি করেন এবং সেই প্রাণীটিকে পাহাড়েই চরে বেড়াতে আদেশ দেন। বলাই বাহুল্য সেই প্রাণীটির নামই তাকিন। এবং সেই থেকেই নাকি এই প্রাণীটিকে পূর্ব হিমালয়ের ভারত-চীন-ভুটান সীমান্তের আশপাশ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত ভারতবর্ষের একমাত্র অরুণাচলেই কেবল এই প্রাণীটিকে দেখা যায়। এই কাহিনীর পৌরাণিকতা এতটাই প্রবল যার ফলে এটি ভুটানের জাতীয় পশুর মর্যাদাও পেয়েছে। পশুটির আপাত দর্শনে ছাগলের মতোই কিছু একটা মনে হবে। তবে মাথায় সিং কিংবা মুখের ছাঁচ দেখলে একঝলকের জন্য গরুর কথাও মনে হতে বাধ্য। গায়ের রঙ অনেকটা ঘি-বর্ণের। এই হলো তাকিন।

ভুটানবাসীর কাছে তাকিন যতই আদরণীয় হোক না কেন, বহির্বিশ্বের মানুষজনের কাছে তাকিন কিন্তু বেশ অপরিচিত। বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলে এর বাসস্থানের ফলে ও মানুষের এনিয়ে আগ্রহহীনতার কারণে চোরাশিকারিদের পোয়া বারো। ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অব্ ইন্ডিয়ার জীব-বিজ্ঞানীগণ সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখেছেন ভারতে এই প্রাণীটির সংখ্যা বারোশ'র মতো। ১৯৭২-এর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের আওতায় এই মূহূর্তে পয়লা নম্বরে রয়েছে কৃষ্ণসার হরিণ, দুর্লভ ছাগলের মতো প্রজাতিরা। ইন্টারন্যাশানাল ইউনিয়ান ফর কনজারভেশন অব্ নেচার (আই ইউ সি এন) তাদেরকে বিপন্ন প্রজাতির মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করেছে। ডব্লুউ টি আই-এর প্রতিনিধিদল তাকিনের চারটি প্রজাতির মধ্যে অন্যতম মিসমি তাকিনের ১০০টি সিং পড়ে থাকতে দেখেন অরুণাচলের আপার সিয়াং পার্বত্য অঞ্চলের আলপাইন বনাঞ্চলে। এরপরেই টনক নড়ে তাঁদের। বিস্তর অনুসন্ধান চালিয়ে অরুণাচলের দিবাং ভ্যালি, আপার সুবাংসিরি, লোহিত উপত্যকা এবং তাওয়াং-এ তিনশ' তাকিনের সন্ধান পান তাঁরা। তবে অনুসন্ধানকারী দলের প্রধান সুনীল কায়ারং জানিয়েছেন, সিকিমে তাকিনের অস্তিত্ববাহী কোনও কিছুর সন্ধান পাননি তাঁরা। তবে তাঁরা চিন্তিত যেভাবে তাকিনের বসবাসের জন্য বনাঞ্চল ছোট হয়ে আসছে ও চীনের মদতে সেখানে যে চোরাগোপ্তা হামলা চলছে তা প্রাণীটির জন্য ভবিষ্যতে কোনও শুভ ইঙ্গিত বহন করছে না।

এই জীবটির নামই তাকিন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, ভারতবর্ষের কোনও চিড়িয়াখানাতেই এই বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীটি স্থান পায়নি। চীন এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশের চিড়িয়াখানায় এই প্রাণীটির দেখা মিলবে। চেক প্রজাতন্ত্রে এর সন্তান উৎপাদনের প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, ভারতের তাতে নিরুৎসাহ।

অসমের আকাশে মাওবাদী মেঘ

বাসুদেব পাল

জঙ্গি কার্যকলাপ ও সন্ত্রাসবাদের দৌরাত্ম্যে জর্জরিত উত্তর পূর্বাঞ্চলেও সংগঠন বিস্তৃত করার কথা ভাবছে মাওবাদীরা। অসমে উলফা, ইউ পি ডি এস (কার্বি জঙ্গি গোষ্ঠী), ডি এইচ ডি প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে মাওবাদীদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে খোদ রাজ্য সরকারের কাছে খবর রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ নিজেই এই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করেছেন। মাওবাদীরা অসমে ঘাঁটি গেড়ে সাংগঠনিক কাজকর্ম বিস্তার করলে তা যে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

নানা জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কার্যকলাপে গত ৩০ বছরে অসমের উন্নয়ন অনেকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এসময়ে রাজ্যে কিছুটা শান্ত অবস্থা রয়েছে। বড়োল্যাণ্ড এলাকায় এন ডি এফ বি এবং বি এল টি সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার ফলে এলাকার পরিস্থিতি অনেকটা পরিবর্তিত হয়েছে। কিছু কিছু আন্তর্গোষ্ঠীগত খুনোখুনির ঘটনা ছাড়া জনজীবনকে বিধ্বস্ত করার মতো হামলাবাজি বন্ধ হয়েছে। বি টি এ ডি (বড়ো টেরিটোরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট) কর্তৃপক্ষ উন্নয়নে জোর দেওয়ায় বিক্ষুব্ধরাও বন্দুকের ভাষা বদল করছে। এবারকার বি টি সি-র নির্বাচন প্রায় শান্তিপূর্ণ হওয়ায় ওই অঞ্চলের মানুষের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাই প্রকাশ পেয়েছে। দুই পার্বত্য জেলা—কার্বি আংলং এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় ইউ পি ডি এস (কার্বি জঙ্গি গোষ্ঠী) এবং ডি এইচ ডি ও ডি এইচ ডি (জুয়েল গার্লোসা) সরকারের সঙ্গে অস্ত্র বিরতি চুক্তি করায় পরিস্থিতি অনেকটা বদলে গেছে। তবে উত্তর কাছাড়ে নাম বদলকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও উলফার সঙ্গে শান্তি বৈঠকের উদ্যোগ দেখা দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে মাওবাদী উৎপাত দেখা দিলে নতুন সংকটের সৃষ্টি হবে। বিশেষ সূত্রমতে, বিগত কয়েক বছরে ইউ পি ডি এস জঙ্গিরা ঝাড়খণ্ডে মাওবাদীদের কাছে নিয়মিত অস্ত্রশস্ত্রের ট্রেনিং নিয়েছে বলে খবর। সেক্ষেত্রে মাওবাদীরা তাদের কাছে প্রতিদান চাইতেই পারে।

আর্থিক প্রগতির নিরীখে অসম দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশ পিছিয়ে। এবার মাওবাদীরা রাজ্যের জঙ্গিদের হাত ধরে নতুন করে ঝামেলা পাকানো শুরু করলে তা স্বাভাবিক উন্নয়নের ধারাকেই ব্যাহত করবে। তবে, অসমবাসীরা জঙ্গি উপদ্রব সইতে সইতে এখন যথেষ্ট পোক্ত।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, অসমের মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর অত্যাচার সহ্য করেছে। তার যন্ত্রণা ভোগ করেছে। তাই তারা নতুন কোনও সন্ত্রাসবাদকে আর মনের দিকে গ্রহণ করবে না বলেই মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় মাওবাদীরা অসমের কোকরাঝাড় জেলার বড়ো উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে চীনে তৈরি আধুনিক স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র কিনছে বলে খবর। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা মঙ্গল মাহাত ও মন্মথ মাহাতকে অসম পুলিশ কোকরাঝাড়ের জে বি রোডের এক হোটেল থেকে কার্তুজ ও আপত্তিকর নথিপত্র সহ গ্রেপ্তার করেছে। মাওবাদীদের সঙ্গে অসমের বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠতা, যোগাযোগ অসম পুলিশকে চিন্তায় ফেলেছে।

করিমগঞ্জে জাল-নোট চক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তান বা বাংলাদেশ থেকে জালনোট ভারতে ঢুকছে এটা কোনও নতুন কথা নয়। তবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মুসলিমবহুল এলাকাতেও জাল ভারতীয় নোট ছেপে বাজারে চালান দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি অসমের করিমগঞ্জ জেলার বারইগ্রাম থেকে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার জাল ভারতীয় টাকা (নোট) সহ টাকা ছাপানোর যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে করিমগঞ্জ পুলিশ এবং বি এস এফ যৌথভাবে। এরপরই পুলিশ কাছাড় জেলার শিলচরেও অভিযানে নামে। শিলচরে সোনাই রোডে নাগাটিলা এলাকার একটি হোটেলের সামনে থেকে তাজউদ্দিন (২২), নবেন্দু দাস (২৪), মানিকউদ্দিন (২৬)-কে আটক করে। তাদের কাছ থেকে আরও দু'লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার জালনোট (প্রতিটি ৫০০ টাকার) উদ্ধার হয়েছে। দুষ্কৃতীদের করিমগঞ্জ থানায় নিয়ে এসে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর এবং গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছে পুলিশ এবং বি এস এফ। ধৃত ও আটক যুবকদের দেওয়া তথ্যের সূত্র ধরে করিমগঞ্জ থানার পুলিশ অফিসার প্রভাত শইকিয়া পুলিশবাহিনী নিয়ে বি এস এফ-এর সহযোগিতায় বারইগ্রাম স্টেশন রোডের আবু বক্করের কম্প্যুটারের দোকানে হানা দেন। সেখানে কম্পিউটার, প্রিন্টিং মেশিন, স্ক্যানার ইত্যাদি উদ্ধার করলেও দোকান মালিক আবু বক্করকে পুলিশ ধরতে পারেনি। সে পালিয়ে যায়। এরপর নিরাপত্তাবাহিনী রাত্রিতে পুলিশ ও বি এস এফ ইলামপুর জিপি-র গন্ধর্বখানি গ্রামের এমাদউদ্দিনের বাড়িতে রেড করে। সেখানেও পুলিশ ১৫ হাজার টাকার জালনোট (১০০ ও ৫০০ টাকার), জালনোট ছাপার মেশিন ও অনেক কাগজপত্র উদ্ধার করে। এমাদউদ্দিন গ্রেপ্তার হয়। এমাদউদ্দিনের ভাই মহবুব রহমানকেও গ্রেপ্তার করা হয়। বাজেয়াপ্ত কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য জিনিসপত্র আপাতত করিমগঞ্জ পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। তবে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ থানা থেকেই মহবুবকে ছেড়ে দিয়েছে। করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বসবাসকারী ভারতীয়রা জালনোটের রমরমা কারবারে বেশ নাজেহাল। পুলিশ ও বি. এস. এফ-এর উদ্যোগে কিছু দুষ্কৃতী ধরা পড়ায় তারা কিছুটা হলেও খুশী। তবে নিরাপত্তাবাহিনী আর একটু বেশী করে তৎপর হলে অনেক কুশীলব ধরা পড়তে পারে।

প্রসঙ্গত, করিমগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা বাংলাদেশ সীমান্তের সঙ্গে রয়েছে। উভয়পারেই রয়েছে বাংলাভাষী মুসলমান। রয়েছে মসজিদ ও মাদ্রাসা।

জাল-নোটসহ ধৃত দুষ্কৃতীরা।

মালদায় কবরস্থানের জন্য কোটি টাকা

তরুণ কুমার পণ্ডিত ঃ মালদা॥ মালদা জেলাতে বামফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘু ভোট নিজেদের কব্জায় আনার জন্য এবার কবরস্থান সংস্কারের জন্য দরাজ হস্তে টাকা ঢালা শুরু করলেন। এমনিতেই জেলাতে প্রতিদিনই মাদ্রাসাগুলিকে অনুমোদন দেওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এর ওপরে জেলা সংখ্যালঘু দপ্তর কবরস্থানগুলিকে ঘেরা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বামফ্রন্ট সরকার আবার দেড় কোটি টাকা বরাদ্দ করল। অথচ হিন্দুদের শ্মশানগুলির জন্য সরকারীভাবে কোনও অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা নেই। সদুল্লাপুর মহাশ্মশান ছাড়া জেলার দূর-দূরান্তে অনেক শ্মশানে রোদ বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনও চালার ব্যবস্থা নেই। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, বামফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘুদের আর কত তোষণ করবে? মালদার জেলাশাসক শ্রীধর ঘোষ জানিয়েছেন, ওই টাকাতে হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, কালিয়াচক, মানিকচক, ইংলিশবাজার ব্লক এলাকার ১৮টি স্থানের কবরখানার পাঁচিল তৈরিতে খরচ করা হবে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর বিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থ বরাদ্দ করেছে এবং জেলায় বেকারদের জন্য দু'লক্ষ টাকা করে ঋণের ব্যবস্থা হয়েছে। হিন্দু তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য তেমন কোনও আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা আলাদা ভাবে করা হয়নি বলে এস. সি. এস. টি.-দের গঠনের পক্ষে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

১২৬টি পুরসভার নির্বাচনে বিজেপির ভাল ফলের আশা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ তীব্র গরমের চোটে দক্ষিণবঙ্গে এখন 'লু' বইছে। গরমের হলকাটা আরও মালুম হচ্ছে পৌর-নির্বাচনের দাপটে। সুদূর রাজস্থানেও এহেন বঙ্গীয় গরমের সম্যক উপলব্ধি হবে। আগষ্ট মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজস্থানে যে ১২৬টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ভরা বর্ষার মরসুমেও সেই আঁচ স্তিমিত হবার কোনও সম্ভাবনা অন্তত এখনও অবধি চোখে পড়ছে না। শাসক কংগ্রেস আর বিরোধী বিজেপি-র

তরজা প্রচণ্ড দাবদাহেও হটকেকের মতোই বিকোচ্ছে রাজস্থানবাসীর কাছে।

রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এ কে পাণ্ডে জানিয়েছেন, নির্বাচন তালিকা সংশোধনের কাজ ইতিমধ্যেই তাঁরা শুরু করে দিয়েছেন এবং আগামী ১২ জুলাই-এর মধ্যে সেই তালিকা তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। যদিও রাজ্য নির্বাচন কমিশন এখনও অবধি নির্বাচনের দিনক্ষণ তৈরি করে উঠতে পারেনি, কিন্তু কমিশন সূত্রের খবর যে আগষ্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তাদের মেয়াদ ফুরনোর আগেই নির্বাচনের ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে চাইছে কমিশন।

জনপ্রিয়তা প্রমাণের নিরীখে পৌর নির্বাচনগুলির বেশ কদর রয়েছে। বিজেপি-র অভ্যন্তরীণ ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে জয়পুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সহ ৪৬টি পুরসভার নির্বাচনে ৩৬টিতেই জয়লাভ করেছে কংগ্রেস। বাকিগুলোতে বিজেপি। এমনকী কিছু পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও নির্বাচনে কংগ্রেস বেশ খানিকটা ব্যাকফুটে ফেলে দিয়েছিল বিজেপি-কে।

এই নির্বাচনে যে পাশা উল্টে যাবার দারুণ কিছু সম্ভাবনা রয়েছে তেমনটা নয়। কিন্তু পুর-পরিষেবার ক্ষেত্রে রাজস্থানের কংগ্রেস সরকার মোটেই উদ্যোগী হয়নি। অন্যদিকে বিগত কয়েকমাসে বিজেপি-ও

অরুণ চতুর্বেদী

তার পায়ের তলার মাটি খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস নির্বাচনে ভাল ফল করায় যে আত্মবিশ্বাসটা তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে, বিজেপি-তে ঠিক সেই আত্মবিশ্বাসটারই অভাব রয়েছে খারাপ ফল হওয়ায়। তবে বিধানসভাকে কেন্দ্র করে বিজেপি-র অভ্যন্তরে যে ডামাডোলের সৃষ্টি হয়েছিল, তার তুলনায় পরিস্থিতি এখন অনেকটাই ভাল। পার্টির সাধারণ সম্পাদিকা হিসেবে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া অধুনা দিল্লী নিবাসী হলেও রাজ্যস্থানে পার্টির কাজে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করছেন। রাজস্থানে বিজেপি-র অস্থায়ী (অ্যাড হক) সভাপতি অরুণ চতুর্বেদী-র কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতেই হয়। প্রকৃত নেতার মতোই সংগঠনের কর্মীদের পরিচালনা করছেন তিনি। চতুর্বেদী এবং সিন্ধিয়া দু'জনেই পরিকল্পনা নিয়েছিলেন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিজেপির সাম্প্রতিক দিল্লী র‍্যালিতে যত বেশি সংখ্যক বিজেপি কর্মীদের হাজির করানো যায় তা নিয়ে। এর জন্য প্রচুর খাটতেও হয়েছিল তাদের। এখন বলা যেতেই পারে যে তাদের সেই পরিকল্পনা একশ' শতাংশ সফল হয়েছে। দিল্লী র‍্যালিতে স্রেফ রাজস্থান থেকেই হাজার পঞ্চাশেক কর্মী যোগদান করেছিলেন বলে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সূত্রের খবর।

এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে অরুণ চতুর্বেদীর মন্তব্য—"এর মধ্য দিয়ে আমাদের (বিজেপি-র) কর্মীদের উদ্দীপনাই প্রতিফলিত হয়েছে। যার জন্য আমাদের আশা, আসন্ন ১২৬টি পুরসভার নির্বাচনে আমরা যথেষ্ট ভাল ফল করতে পারব।"

কংগ্রেসও ইতিমধ্যেই ভোটের ময়দানে জোর কদমে নেমে পড়েছে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সি পি জোশী তাঁর সহকর্মীদের সাথে একপ্রস্থ আলোচনা সেরে গিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বিজেপি-তে সাংগঠনিক নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতি মনোনয়নের কাজও পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে। বিজেপি-র পক্ষে স্বস্তির কথা সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে গোষ্ঠীকোন্দল সেখানে একেবারেই নেই। বরঞ্চ বলা ভাল, অরুণ চতুর্বেদীর নেতৃত্বগুণে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ভুলে পুর-নির্বাচনকেই পাখির চোখ করেছে রাজস্থান বিজেপি। বিজেপি পার্টিকর্মীদের আশা, নতুন সভাপতির নেতৃত্বেই এবার পুর-নির্বাচনে লড়তে চলেছে বিজেপি।

লাভলিন মামলা

আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছেন বিজয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ লাভলিন কেলেঙ্কারী মামলায় তাদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে সিবিআই জানিয়ে দিল এই মামলা থেকে কাউকে অব্যাহতি দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

পিনারাই বিজয়ন

প্রসঙ্গত, সি বি আই-এর বিরুদ্ধে সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে যে লাভলিন কেলেঙ্কারী মামলায় সপ্তম অভিযুক্ত কেরলে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক পিনারাই বিজয়নকে চাপের মুখে বিনা-কারণবশত ক্লিনচিট দিতে চলেছে তারা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১ এপ্রিল সিবিআই-এর তরফ থেকে এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সিবিআই প্রথমে বলেছিল, পিনারাই বিজয়ন বা অন্য কেউ লাভলিন কেলেঙ্কারী মামলায় টাকা খেয়েছেন এইরকম কোনও তথ্য প্রমাণাদি এখনও তাদের হাতে আসেনি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, যেখানে লাভলিন কেলেঙ্কারীতে ৩৭৪.৫ কোটি টাকার দুর্নীতির কথা প্রত্যেকেই জানে সেখানে কিভাবে সিবিআই অভিযুক্তদের পক্ষে প্রমাণহীনতার কথা বলতে পারে? এ তো অভিযুক্তদেরই এক প্রকার সুবিধে করে দেওয়া হলো।

বর্তমানে চেন্নাই-তে কর্মরত, আদতে তিরুবনন্তপুরমের বাসিন্দা পেশায় ঠিকাদার দীপক কুমার কোচির বিশেষ সিবিআই আদালতে জানিয়েছেন লাভলিনের ঘটনায় যে টাকা-পয়সার হাত বদল হয়েছিল, তিনি তার প্রত্যক্ষদর্শী। ওই আদালতকে তিনি আরও জানিয়েছেন যে, এস এন সি লাভলিন চুক্তির ব্যাপারে আরও অনেক গোপনীয় তথ্য তাঁর জানা রয়েছে। কারণ সেই সময় তিনি এই চুক্তির মধ্যস্থতাকারী দিলীপ রাহুলের সহকর্মী ছিলেন। ফলে লাভলিন চুক্তির ব্যাপারে ঘুষ কান্ডের বহু দৃশ্যের সাক্ষী তিনি। দীপক কুমারের করা পিটিশানে বারে বারেই ঘুরে ফিরে এসছে সি পি আই এম-এর কেরলের সম্পাদক পিনারাই বিজয়নের নাম।

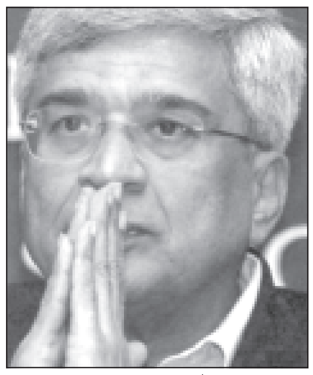
প্রকাশ কারাট

সি বি আই-এর বিশেষ আদালতে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির পক্ষ থেকে গত ১৭ এপ্রিল দাবী করা হয়, এমন কোনও তথ্য-প্রমাণাদি নেই যা দিয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে যে পিনারাই বিজয়ন বা এই মামলার সঙ্গে জড়িত কেউ আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। এহেন যুক্তির সামনে সি বি আই প্রাথমিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও পরে পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলে, লাভলিন ঘুষ কাণ্ডে যেমন প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, তেমনি তাদের কথা বিশ্বাস করার মতো কিছু 'সাপোর্টিং এভিডেন্স' হাতে রয়েছে সি বি আই-এর।

বিশেষ সূত্রের খবর, কানাডিয়ান কোম্পানী এস এন সি লাভলিন-এর যে ৮৬ কোটি টাকার আর্থিক ফায়দা হয়েছিল তার পুরোটাই কিন্তু অনৈতিক পথে এসেছিল। এমনই খবর রয়েছে সি বি আই-এর কাছে। সি বি আই আরও জেনেছে এফিডেফিটের বয়ানটা এই আর্থিক-দুর্নীতির পূর্বেই রচিত হয়ে গিয়েছিল। সি বি আই জেরা করেছে এই মামলার আরেক মধ্যস্থতাকারী নাসেরকে। সি বি আই-এর তদন্তে এখনও অবধি বারেবারেই উঠে আসছে পিনারাই বিজয়নের নাম। পিনারাই সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাটের কাছের লোক হওয়ায় তাকে বাঁচাতে তৎপর হয়েছে কারাট-গোষ্ঠী।

কলকাতার জলাভূমির জলাঞ্জলি

নিজস্ব সংবাদদাতা।। জলাভূমি বোজানোর বিরুদ্ধে আইন, এমনকী শাস্তির বিধানও রয়েছে এই রাজ্যে। কিন্তু তার বিন্দুমাত্র ধার না ধরে চলছে ভরাট। সরোবর বুজিয়ে মাথা তুলছে বহুতল। বিপন্ন এই শহরের সবুজ। ই এম বাইপাসের ধারঘেঁষা জলাভূমির দখল নিয়ে উত্তেজনা চলেছিল কিছুদিন। মৎস্য দফতরের অজ্ঞাতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অনুমতিতে ১৫ একর জলাভূমি বোজানোর প্রচেষ্টায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন মৎস্যমন্ত্রী কিরণময় নন্দ। তাঁর দফতরের সঙ্গে আলোচনা করলে নাকি তিনি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আইনগত ভাবে ওই জলাভূমির মালিকানা পাইয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। অর্থাৎ দুই দফতরের লড়াইয়ে পরিবেশ গৌণ, আসল কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি।

জলাভূমির সংজ্ঞা নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও ১৯৭১ সালে ইরানের রামসার শহরে জলাভূমি সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে সংজ্ঞা ঠিক করা হয় তা বেশিরভাগ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। ওই সম্মেলনে জলাভূমির সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা হয়—স্থায়ী বা প্রবহমান, প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম, জল, বিল, আংশিক সময়ের জলা, যা স্বাদু বা লবণাক্ত জলের দ্বারা সম্পৃক্ত এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে ভাঁটার জলরেখা থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত গভীরতাযুক্ত সেই অঞ্চলকে জলাভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।

জলাভূমির সংখ্যা ও আয়তন কত তা আলাদা করে নথিভুক্তকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৯০-এর দশকের গোড়া থেকে। ভারত সরকারের পরিবেশ ও বনমন্ত্রক উপগ্রহ থেকে পাঠানো তথ্য থেকে জলাভূমির পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ঢত্রত্মখ)-র অন্তর্গত আমেদাবাদের স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (ত্রট্টত্র)-র উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। এঁদের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ভারতবর্ষে জলাভূমির পরিমাণ হচ্ছে ৪.১ মিলিয়ন হেক্টর। ১.৫ মিলিয়ন হেক্টর হচ্ছে প্রাকৃতিক ও ২.৬ মিলিয়ন হেক্টর মনুষ্যকৃত। বাদাবনের পরিমাণ হচ্ছে ০.৬ মিলিয়ন হেক্টর।

পশ্চিমবঙ্গে পৌর এলাকাসহ গ্রামীণ এলাকায় ২.৫ হেক্টরের কম আয়তনের প্রচুর বিলসহ জলাভূমি রয়েছে। ভারতবর্ষে এবং পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ থেকে ছোটো জলাভূমিকে কেন্দ্র করে অনেক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গেরই বিভিন্ন জেলার মধ্যে রয়েছে সুন্দরবন, মিরিক লেক, কোচবিহারে রসিক বিল, উত্তর দিনাজপুরের কুলিক, বর্ধমানে পূর্বস্থলীর চুনিচর, হুগলীতে সবুজ দ্বীপ, কলকাতার বিজ্ঞাননগরীর পাশে নলবন, রবীন্দ্র সরোবর, সুভাষ সরোবর, মুর্শিদাবাদের আহিরণ ঝিল, মতিঝিল, হাওড়ার সাঁতারাগাছি ঝিল এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ছোট ও বড় জলাভূমি আজ পর্যটন ও বিনোদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জলাভূমি জলচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি কার্বনচক্র, নাইট্রোজেন চক্র নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সূর্যালোকে জলাভূমিস্থ সবুজ শৈবাল এবং অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত খনিজ পদার্থগুলির উপস্থিতিতে বাতাসের কার্বনডাই অক্সাইডকে শোষণ করে বাতাসে অক্সিজেন ছাড়ে। জলাভূমির জল মাটির ভিতর দিয়ে ভূগর্ভস্থ জল স্তরের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। জলাভূমির সবুজ শৈবালও জলাভূমিস্থ উদ্ভিদ বাতাসের কার্বনডাই অক্সাইড সহ অন্যান্য দূষিত গ্যাস ও ধূলিকণা শোষণ করে। জলাভূমির উদ্ভিদ তরল বর্জ্য পদার্থকে পরিশোধন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রতিবছর তাই সারাপৃথিবী জুড়ে ২রা ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক জলাভূমি দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। তবুও পশ্চিমবঙ্গে জলাভূমির জলাঞ্জলি পর্ব চলছে এখন। শিল্পোন্নয়ণের নামে যত্রতত্র জলাভূমি বোজানোর কাজ চলছে। কলকাতা এর ব্যতিক্রম নয়। ২০০২ সালে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে রামসার সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র রামসার সাইট হচ্ছে এই জলাভূমি। কলকাতা শহরের ময়লা জল পরিশোধন, মাছ উৎপাদন, কলকাতার দূষিত গ্যাস শোষণ, জীববৈচিত্র্যের আধার ইত্যাদি ভূমিকা পালনের জন্য পূর্ব কলকাতার জলাভূমিকে রামসার সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পূর্ব কলকাতার জলাভূমির আয়তন হচ্ছে ১২,৭৪১ হেক্টর। পূর্ব কলকাতা জলাভূমি কলকাতা শহর থেকে নির্গত ময়লা জলের উপর নির্ভরশীল। কলকাতা শহর থেকে নির্গত ময়লা জল শহরের ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও খোলা নর্দমার মাধ্যমে শহরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ময়লা জল নিষ্কাশনের জন্য ৮টি পাম্পিং স্টেশনে গিয়ে পড়ে। এই পাম্পিং স্টেশনগুলি থেকে পাম্পের দ্বারা ময়লা জল প্রায় পাঁচটি ময়লা জলের খালের মধ্যে দিয়ে বানতলার কাছে মূল ময়লা জলের খালে নিষ্কাশন করা হয়। এই প্রধান মূল ময়লা জলের খাল ২৭ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সুসিমাটায় বিদ্যাধরী নদীতে গিয়ে কলকাতার ময়লা জলকে ফেলে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে অনেকাংশে মাছ চাষ, ধান চাষ, সবজি ও ফুল চাষের জন্য ব্যবহার করা হয়। মোট ১২৭৪১ হেক্টরের মধ্যে ৩৬৪টি ভেড়ি ছিল এককালে। যার মোট আয়তন হচ্ছে ৫৮৫২ হেক্টর। বর্তমানে ভেড়ি রয়েছে ২৭০টি। ভেড়ি ছাড়াও রয়েছে অজস্র জলাশয়। কিন্তু নেই কোনও যথাযথ মানচিত্র। তাই এই জলাভূমির আনাচে-কানাচে গেলেই চোখে পড়বে কোথাও কাঁটাতারের বেড়া আবার কোথাও কিছুটা অংশ বোজানো। এভাবেই হারিয়ে গেছে মোল্লার ভেড়ি, চৌবাগার ঘোষের ভেড়ি। সম্প্রতি সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে মাদুরদহ ভেড়ি। সরকারি উদ্যোগে যার মালিক এখন বিখ্যাত এক প্রবাসী বাঙালী বিজ্ঞানী। অথচ রামসার সাইট ঘোষণা হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিধানসভায় এই জলাভূমি রক্ষার জন্য একটি বিল পাশ করে যা পরবর্তীকালে আইনে পরিণত হয়। আইন বলে, কোনও জলা জমিই বোজানো যাবে না, কিন্তু সেই আইনকে তুড়ি মেরে সরকারই দিব্যি বন্টন করে দিচ্ছে জলা। ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যাণ্ডস ম্যানেজমেন্ট অথরিটি সূত্রে খবর—হেরিটেজ স্কুলও তৈরি হয়েছে পূর্ব কলকাতার জলাভূমির একটা অংশ বুজিয়ে। জলাভূমি বুজিয়ে তৈরি হচ্ছে বাণিজ্যিক ভবন। প্রশাসন নির্বিকার। সব বিষয়ে অস্বচ্ছতার ছবি।

কলকাতা ও বিধাননগর উপনগরীর ভূ-জল সম্পদ

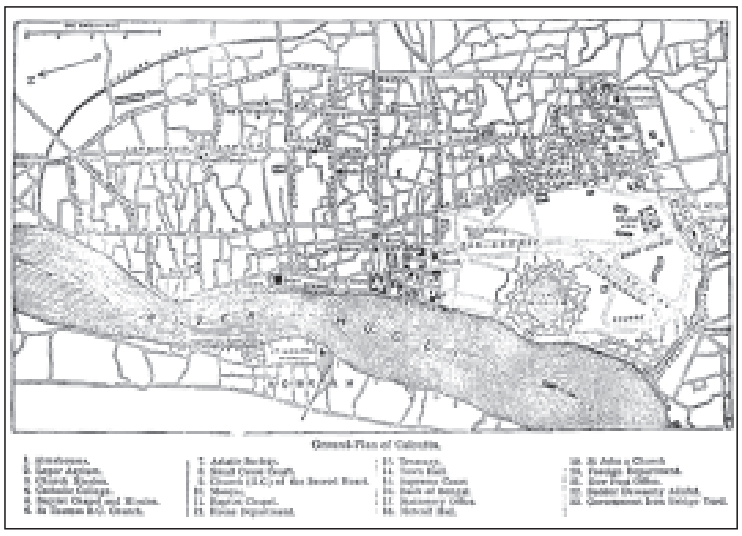

নিজস্ব সংবাদদাতা।। কলকাতা শহর ক্রমশই বেড়ে চলেছে—তাই বেড়ে চলেছে পানীয় জলের চাহিদাও। যেহেতু নদীর জল পরিশোধন করে শুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহে অনেক অর্থ খরচ তাই ভূগর্ভস্থ জলের উপরই নির্ভরতা বেড়েছে। কলকাতা শহরের পাশে বেড়ে ওঠা বিধাননগর, রাজারহাট নিউটাউন এবং হাওড়া উপনগরীতে তাই পানীয়জল জোগানের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার ক্রমশই দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে নগরায়ণের ফলে বৃষ্টির জল মাটির নীচের জলস্তর সেভাবে সম্পৃক্ত করতে পারছে না। একদিকে ক্রমবর্দ্ধমান ভূগর্ভস্থ জলের চাহিদা ও অন্যদিকে এই ভূজলের ঘাটতি কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সমস্যার সৃষ্টি করছে। এমন দিন আসতে চলেছে যখন আর ভূগর্ভস্থ জল মিলবে না।

কলকাতার ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থান নিয়ে অনেক সমীক্ষা হয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে কলকাতা শহরের ভূ-জল বিন্যাসকে পাঁচটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঁচটি অংশ হলো উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল।

উত্তর অঞ্চলে ৩৮-৫৮ মিটার কাদামাটির নীচে এক বৃহৎ জলস্তর প্রায় ২০০ মিটার নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জলস্তরের ক্রমরেখা অবস্থান করছে ১৪-১৭ মিটার গভীরে। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাশের সন্নিহিত অঞ্চলে মিষ্টি সুস্বাদু জলস্তর মাটির নীচে ৫০ থেকে ১৩৫ মিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্রমরেখা ৯ মিটার থেকে ১৫ মিটার গভীরে। এখানে জায়গায় জায়গায় যদিও ভূ-জলের গুণগত মানের সমস্যা রয়েছে। ওইসব স্থানে জল প্রায় লবণাক্ত। পশ্চিম অঞ্চল অর্থাৎ তারাতলা, খিদিরপুর, গার্ডেনরীচ, মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে দুটি ভিন্ন ভিন্ন জলস্তর (৬৫ থেকে ১৫৫ এবং ১৮৫-২৬৫ মিটার) পাওয়া যায়। প্রথম জলস্তরটি লবণাক্ত। সুস্বাদু মিষ্টিজলের জলস্তর সাধারণত ১৮৫-২৬৫ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই জলস্তরের ক্রমরেখা ১৮ থেকে ২০ মিটার গভীরে অবস্থিত। মধ্যাঞ্চলে অর্থাৎ বিবাদী বাগ, ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রীট, পার্ক সার্কাস, লোয়ার সার্কুলার রোড প্রভৃতি অঞ্চলে মিষ্টি সুস্বাদু জলের সন্ধান মেলে ৮০ থেকে ১৫০ মিটার গভীরতায়। এখানে জলস্তর প্রায় ১৮ মিটার নীচে। গত পনের বছরে অনেক বেশী মাত্রায় জল উত্তোলনের ফলে জলস্তর প্রায় ১৫ মিটার নীচে নেমে গেছে।

দক্ষিণ অঞ্চলে অর্থাৎ গড়িয়াহাট, রাসবিহারী, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, টালিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে কোথাও মিষ্টি জল আবার কোথাও জল প্রায় লবণাক্ত। এই অঞ্চলে জলে আয়রণের পরিমাণও বেশী। এখানেও অতিরিক্ত জনবসতির ফলে ভূজলের ব্যবহার বেশী। তাই জলস্তর গত দশ বছরে ১০ মিটার নীচে নেমে গেছে।

রাজারহাট (নিউটাউন) উপনগরীতে ৬০ থেকে ১৫০ মিটার গভীরতায় মিষ্টি জলের জলস্তর রয়েছে। তবে এখানে জলস্তরের উপরিভাগে সাধারণত ৫০ থেকে ৬০ মিটারের মধ্যে কোথাও আর্সেনিক মিলছে। বিধাননগর অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থান কলকাতা থেকে কিছুটা আলাদা। একটি হিসেব মতো কলকাতা শহরে প্রতিদিন ৭০ থেকে ৭৫ মিলিয়ন গ্যালন জল তোলা হয়ে থাকে। এই জল তোলা হয় নলকূপের সাহায্যে। নলকূপগুলিতে যন্ত্র চালিত টারবাইন বা সাবমারসিবল পাম্প ব্যবহার করা হয়। এছাড়া হস্তচালিত পাম্পের সাহায্যেও নলকূপ থেকে জল তোলা হয়। কলকাতা শহরের পূর্ব ও দক্ষিণ উপকণ্ঠে দ্রুত নগরায়ন হওয়ার ফলে ভূ-জল ব্যবহারের পরিমাণও দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এতে ভূ-জল ভাণ্ডারে টান পড়ছে। এভাবে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভূ-জল তোলার ফলে ইতিমধ্যেই কলকাতার ভূমিস্তর বসে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ষাটের দশকে কলকাতা শহরের অদূরে বিধাননগরে এক উপনগরীর সূচনা হয়েছিল। বিধাননগর নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করেছিল নগর উন্নয়ন দপ্তর। প্রথম অবস্থায় ওই সংস্থা ১৫টি ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ করেছিল ১-২ ও ৩নং সেক্টরের বিস্তৃত এলাকা পরিবেষ্টন করে। প্রতিটি স্থানে একটি করে ওভারহেড জলাধার (এক লক্ষ কুড়ি হাজার গ্যালন জলধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণ হয়েছিল। এছাড়াও তৈরি হয়েছিল একটি করে আণ্ডারগ্রাউণ্ড জলাধার, যার জলধারণ ক্ষমতা ষাট হাজার গ্যালন। মাটির নিচের জলাধারগুলি পাম্পের সাহায্যে মাটির নীচ থেকে জল তুলে ভর্তি করা হয়। এজন্য প্রতিটি স্টেশনে কমপক্ষে দুটি ক'রে গভীর নলকূপ ছড্ডবৃগ্গ নির্মাণ করা হয়েছে।

ভূ-তলের জলের তুলনায় ভূ-গর্ভস্থ জলে যেহেতু লোহার পরিমাণ বেশি একারণে লোহার পরিমাণ কমাতে আয়রণ লিমিটেশন প্ল্যান্ট নির্মাণ হয়েছে। সাথে সাথে যেসব অঞ্চলে জল সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়, সেখানে বুস্টার পাম্পিং স্টেশান নির্মাণ করে জলের যোগানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা নববই-এর দশক পর্যন্ত জল চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই ব্যবস্থার চাহিদা আনুপাতিক দ্রুত মূল্যায়ন করা হয়। বিধাননগরের জল সরবরাহের ব্যবস্থা তখন নোটিফায়েড অথরিটির হাতে অর্পণ করা হয়। এই ব্যবস্থা চালু থাকে ১৯৯৫ সালে বিধাননগর পৌরসভা গঠন পর্যন্ত। আজ ক্রমান্বয়ে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ফলে সর্বোপরি বিধাননগরে জল চাহিদানুগ যোগানের কারণে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। যেহেতু ভূগর্ভস্থ জল সবস্থানে সব অঞ্চলে সমপরিমাণ তোলা হয় না তাই ভূস্তরে ফাঁকা অঞ্চলের সৃষ্টি হচ্ছে। এই প্রবণতা চলতে থাকলে জমির ওপরে গড়ে ওঠা জনপদের ভারসাম্য রক্ষার সংকট দেখা দেবে।

বর্তমানে বিধাননগর পৌরসভা কে এম সি কর্তৃক প্রতিদিন ৬.৫ মিলিয়ন গ্যালন ভূতলস্থ জল ১৫টি জলের পাম্পিং স্টেশন থেকে এবং বুস্টার পাম্পিং স্টেশন থেকে সরবরাহ করা হয়। বিধাননগরের প্রধান অঞ্চলে ১৫টি জলের ট্যাঙ্কে প্রতিদিন কে এম সি কর্তৃক জল সরবরাহ করা হয় ৬.৪ মিলিয়ন গ্যালন। তবে বিধাননগরে জল সরবরাহের প্রধান সমস্যা এই, বিধাননগর পৌরসভার নিজস্ব কোনও ভূতলস্থিত জল পরিশ্রুত ও সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেই। তাই এখানে ভূতলস্থিত জল সরবরাহের জন্য কে এম সি-র উপর নির্ভর করতে হয়।

কলকাতার বস্তি উন্নয়ন জরুরী

নবকুমার ভট্টাচার্য।। যে কোনও শহরে বিশেষ করে মেট্রোপলিটান এলাকায় বস্তি রয়েছে। মুম্বাই দিল্লিতেও বস্তি রয়েছে। কলকাতাও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও কলকাতার বস্তিগুলির এখন নাম দেওয়া হয়েছে 'নগরপল্লী'। কলকাতা পুরসভা এলাকায় নথিভুক্ত ও অনথিভুক্ত মিলিয়ে সাড়ে পাঁচ হাজার বস্তির আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন না হলেও পুরসভা খাতায় কলমে বস্তি কথাটি তুলে দিয়েছে। তবে বস্তি আছে বস্তিতেই। নাম পরিবর্তন হলেও বস্তির উন্নয়ন হয়নি, বাড়েনি বস্তিতে বসবাসকারী মানুষের মান। তাই আজও বস্তিগুলি দগদগে ক্ষতের মতো বিরাজমান। যেখানে দৈন্যক্লিষ্ট মানুষগুলিকে দেখলেই বোঝা যায় বাজার অর্থনীতির যুগে দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন আকাশ- কুসুম কল্পনা।

২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী কলকাতা পুরসভা এলাকার ১৪১টি ওয়ার্ডের মোট জনসংখ্যা ৪৫,৮০,৫৪৪। এই জনসংখ্যার ১৪.৯১ লাখ অর্থাৎ ৩২.৫৫ শতাংশ বস্তিবাদী। অর্থাৎ মহানগরীর প্রতি তিনজনের একজন লোক বস্তিতে বাস করে। কলকাতা পুরসভা এলাকার মোট আয়তন ১৮৭.৩৩ বর্গকিমি আর যার মধ্যে ২১.৩৩ বর্গকিমি এলাকা বস্তিবাসীর দখলে। এই ২১.৩৩ বর্গকিমি এলাকার মধ্যে কোনওরকমে বেঁচেবর্তে রয়েছেন ১৪.৯১ লাখ মানুষ। নগরবাসীর জনঘনত্ব যা তার চেয়ে বস্তি এলাকার জনঘনত্ব পাঁচগুণেরও বেশি। অনেকেই জেনে আশ্চর্য হবেন এই কলকাতা শহরে ৩৭ ভাগের ওপর মানুষ বিভিন্ন বস্তিতে বাস করে। সি এম ডি-এ গত ৭০ দশকে এ নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছিল। সেখান থেকেই জানা যায়, যে সমস্ত সুবেশ নরনারী রাস্তায় চলাফেরা করেন এ শহরে তাদের অনেকেই যে বস্তিতে বাস করেন, এ বিষয়টি আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই। তাই কলকাতাকে সার্বিকভাবে উন্নত করতে হলে বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ছাড়া কোনও গতি নেই। ইংরেরাজত্বের সময় গোড়ার দিকে কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই এই শহরের সৃষ্টি। বেঁচে থাকার তাগিদে কাজের সন্ধানে কেবল এরাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকেই নয় আশেপাশের রাজ্যগুলি এমন কি বাংলাদেশ থেকেও ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষ এ শহরে পা দিয়েছে। এই শিকড়হীন ভাসমান মানুষগুলির মাথা গোঁজার ঠাঁই চাই অথচ বাড়ি তৈরি করার মতো আর্থিক রসদও নেই। ফলে সুযোগ বুঝে জমির মালিক অর্থাৎ তৎকালীন জমিদার বস্তির পত্তন করেন। গড়ে তোলা হয় কম খরচে স্বল্প জায়গায় বহুলোকের কোনওরকমে মাথা গুঁজে থাকার জন্য ছোটঘর। বাসের অযোগ্য এই ঘরকেই প্রাসাদ মেনে ঠাঁই করে নেন সহায়সম্বলহীন দুস্থ মানুষগুলো। এই ঘরগুলোতে থাকে না পর্যাপ্ত সূর্যালোক, ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থাও নেই। জলসরবরাহের ব্যবস্থা তো দূরের কথা স্যানিটেশন এর ব্যবস্থাও নেই। ফলে পুরো বস্তি এলাকাটা হয়ে উঠে একটা জতুগৃহ। অগ্নিনির্বাপক কোনও ব্যবস্থা না থাকার ফলে একবার আগুন লাগলে পুরো বস্তিটাই পুড়ে খাক হয়ে যায়।

বসবাসের অযোগ্য এইরকম ছোট ৮০-১০০ বর্গফুট ঘরে অনেক সময় মাচা তৈরি করে তার উপর নীচে কিভাবে ১৫-১৬ জন লোক স্থান সংকুলান করে দিন গুজরান করে তা এক পরম আশ্চর্যের বিষয়। এইরকম আলো বাতাসবিহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য বস্তিগুলি ম্যালেরিয়া ও যক্ষার আঁতুড়ঘরে পরিণত।

কলকাতার বস্তি উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ হয় কিন্তু সেই টাকার সবটাই বস্তি উন্নয়নের কাছে লাগানো হয় না। উদাহরণ হিসেবে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া (ওডিএ) বস্তি উন্নয়নের টাকায় পুরপিতা ও রাজনৈতিক নেতাদের সেপটিক ট্যাঙ্ক তৈরি হয় বলে কে এম ডি এ-র অডিট রিপোর্টে ধরা পড়ার খবর ২০০০ সালে প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে বস্তি নিয়ে আরোও নানা অসংগতির খবর নিত্য প্রকাশিত হচ্ছে। অনুদানের সব টাকা যদি কাজে লাগানো হতো তবে আজ আমূল পরিবর্তন হয়ে যেতো বস্তির অবস্থা। কেবল স্যানিটারি পায়খানা নির্মাণ, রাস্তা বাঁধানো, আলোর ব্যবস্থা ও কিছু পানীয় জলের কল বসিয়ে দিলেই কি বস্তির উন্নয়ন সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আর্থ সামাজিক উন্নয়নের দিকেও নজর দিতে হয় অথচ সেদিকে সরকারের দৃষ্টি নেই। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আবাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন অধরাই থেকে গেছে। মনে রাখতে হবে বস্তিবাসীরাও এই শহরের আর্থ সামাজিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শহরের উন্নয়নে উড়ালপুল, শপিং-মল যেমন প্রয়োজন তেমন বস্তির উন্নয়নও জরুরী। বস্তিবাসীরা যে সমস্ত স্থানে থাকেন অর্থাৎ সমস্ত বস্তির ঘরগুলি প্রায় একতলার। অথচ আজ শহরে জমির মূল্য আকাশ চুম্বি। 'ঠিকাদার টেনেন্সি অ্যাক্ট' অনুসারে এর মালিকানা সরকারি কর্তৃপক্ষের হলেও মাঝে একশ্রেণির ব্যবসায়ী আশ্রয়স্থল তৈরি করে তা ভাড়া দেয়। বর্তমানে জমি ও বাড়ি লাভজনক ব্যবসা বলে কিছু প্রমোটার বস্তি উচ্ছেদ করে বেআইনি ভাবে পাকা বাড়ি তৈরি করছেন। অথচ সরকারি অনুমোদন নিয়ে যদি একতলা বস্তিকে উঁচুতলা বাড়ি করা যায়, তাহলে অনেক বস্তিবাসীকে একই জমিতে আশ্রয় দেওয়া যায়। একসময় কলকাতার প্রাক্তন মহানগরিক কমল বসু এ বিষয়ে তৎপর হলেও পরে তা রূপায়ণ হয়নি। কিন্তু এই প্রকল্প রূপায়িত করলে একসঙ্গে যেমন অনেক আশ্রয়স্থল গড়া যাবে, অপরদিকে কিছু ফাঁকা জমিও পাওয়া যাবে। এতে বস্তিবাসীর জীবনযাত্রারও উন্নয়ন ঘটবে। কলকাতার অনেক বস্তি অসামাজিক কাজকর্মের পীঠস্থান হলেও কলকাতার বস্তিগুলি অনেক প্রকার ছোট ছোট শিল্পেরও আঁতুড়ঘর। যেমন কার্ডবোর্ড শিল্প, বাঁধাই শিল্প, ঘুড়ি শিল্প, পেন, চিরুণি শিল্প, প্লাস্টিক ও রবার শিল্পের কর্মশালা। বস্তিতে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন মেটায় না, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ হয়। কলকাতার ডোমপাড়া, কুমারটুলি, কালীঘাটের পটুয়াশিল্প বস্তিবাসীদের অবদানের সূচক।

কলকাতার মুসলিম মহল্লার জলচ্ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাজাবাজার, কলুটোলা, খিদিরপুর, তিলজলা বা পার্কসার্কাস। মুসলমান পাড়া বলে যা চিহ্নিত মহল্লা পরিচয়ে। মহল্লা নামকরণটি নবাবদের দেওয়া। মুসলমান নবাবদের আমলে লক্ষ্ণৌ দিল্লির প্রতিটি জনপথ পরিচিত হয় মহল্লা হিসেবে। সেই পরম্পরা বহন করছে কলকাতার মুসলমান অধ্যুষিত পাড়াগুলি। বেলগাছিয়ার মোড়ে রয়েছে মুসলিম মহল্লা। অপরিচ্ছন্ন অপরিস্কার এই মহল্লায় রয়েছে গলির মধ্যে তস্য গলি এবং তার মধ্যেই ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি ঘর। এই ঘরেই থাকতে হয় বেশকয়েক জন শিশু মহিলাসহ মানুষকে। ২০০৪-০৫ সালের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের শহরে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের গড় ১২ শতাংশের মতো। মুসলমানদের মধ্যে এই হার ২৭ শতাংশ। এটা সাচার কমিটির হিসেব। মহল্লার সামান্য কয়েকজন পুরুষ রোজগার করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন আর বাকিরা বিনা স্বপ্নেই জীবন কাটিয়ে দেন। মহল্লার মুসলমান পুরুষেরা রাজমিস্ত্রী, বা ছোটখাটো কারখানায় কাজ করেন। মহল্লার যুবক বা যুবতী কলেজে পড়ছে এমন খুব একটা দেখা যায় না। কলুটোলা, তিলজলা মহল্লার বেশিরভাগ শিশুই স্কুল বা মাদ্রাসায় যায় না। ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত মুসলমান শিশুদের মধ্যে কোনওদিন স্কুলে যায়নি এমন শিশুর পরিমাণ কিন্তু ২৫ শতাংশ। বস্তির সঙ্গে মহল্লার পার্থক্য এই যে বস্তির ঘর এবং প্রাঙ্গণ পরিষ্কার কিন্তু সেই তুলনায় মহল্লায় অপরিষ্কার এবং দীনতার লক্ষণ স্পষ্ট।

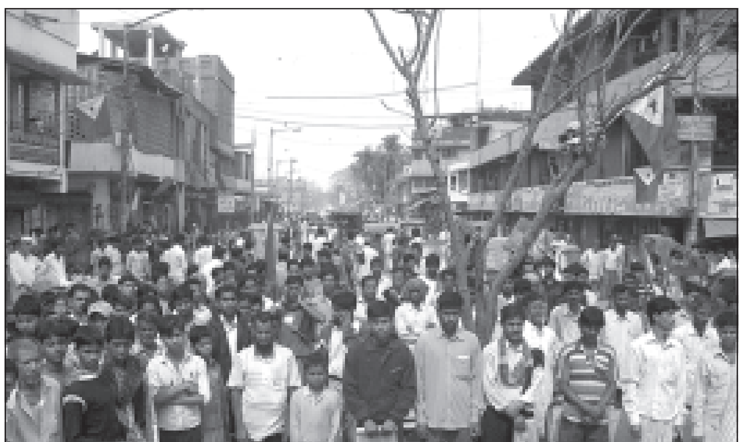

এটা কেন? কলুটোলার ফল বিক্রেতা মহম্মদ আজাদের বক্তব্য, আমরা গরীব আদমি। সামান্য পয়সা রোজগার করে সংসার চলে। বাড়ির বিবি অসুস্থ তাই ঘর অপরিষ্কারই থাকে। মুসলিম সমাজ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন সমাজসেবী কল্লোল খান। তাঁর মতে বস্তির সঙ্গে মহল্লার পার্থক্য এর অন্যতম কারণ অর্থনৈতিক নয়। মুসলিম সমাজের জীবন সম্পর্কে উদাসীনতা এবং আধুনিকতা বর্জিত বলেই এই অবস্থা। জঙ্গলের জনজাতি মানুষেরা কম দরিদ্র নয় কিন্তু তাদের পরিচ্ছন্নতা দেখার মতো। সেই সমাজে নিয়মানুবর্তিতা রয়েছে। তথ্য বলছে মহল্লার কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে চুরি ছিনতাই রাহাজানি বেশি হয়। শিয়ালদহ থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত বাসে সবচেয়ে বেশি পকেটমারি হয়। ২০০৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত সংশোধনাগারের মুসলমানের সংখ্যা ৩০,৭৯৯ জন আর হিন্দুদের সংখ্যা ১৬,৮০৯ এবং অন্যধর্মের ৫৬৭ জন। ২০০৯ সালে এই অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। ডিসি পোর্ট বিনোদ মেহেতাকে কিভাবে মহল্লার ভেতর নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছিল তা আজ ইতিহাস হলেও ভোলা সম্ভব নয়। তিলজলা, মেটিয়াবুরুজ, কসবা আজও আইনশৃঙ্খলা-জনিত সমস্যাসংকুল অঞ্চল।

খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ এককালে ছিটকাপড়, বাজি তৈরি, ঘুড়ি তৈরির জন্য বিখ্যাত হলেও আজ কিন্তু মহল্লাগুলি জঙ্গি এবং অসামাজিক কাজকর্মের আঁতুড়ঘর। মাঝেমাঝেই মহল্লাগুলিতে সিমি, হুজি-র তৎপরতা চলে। ধর্মীয় সংগঠনের আদলে হাদিসের মাধ্যমে কলকাতায় ঘাঁটি তৈরি করতে তৎপর সিমি ও হুজি-র জঙ্গিরা। গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে জোড়াসাঁকো থানা এলাকায় কলিন্স লেনে হাদিসের একটি ধর্মস্থান রয়েছে। বেনিয়াপুকুর থানা, পার্ক সার্কাস, কলুটোলায় এরকম আরও অনেক ধর্মস্থান রয়েছে, যাদের কাজ ধর্মের সাহায্যে জেহাদি তৈরি করা। গোয়েন্দাসূত্রে খবর পার্ক সাকার্স, আকড়া, সন্তোষপুর, মল্লিকপুর, মগরাহাট এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে নানা জঙ্গি সংগঠনের কাজ কারবার।

হিন্দুর ভবিষ্যত

১৯৪৭ সালের পর থেকে আজও পর্যন্ত মুসলমানদেরকে যেভাবে অতিরিক্ত যত্ন বা কদর করা হয় তাতে করে আজকের ধর্মনিরপেক্ষ ভারত আর মুঘল ভারতের মধ্যে কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ভারতবর্ষে মুসলমান বা তাদের জনসংখ্যা যেভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়াচ্ছে তাতে এটা আরো বেশী করে অনুধাবন করতে পারি যে, ভারতবর্ষ মুসলিম রাষ্ট্র হতে চলেছে। যেমন করে ৫৭টি মুসলিম দেশের সৃষ্টি হয়েছে।

ইংরেজ ভারতে মুসলমানদের ভারতীয় হিসাবে কোনও দায় ছিল না, যেমনটা ছিল খিলাফত আন্দোলন এবং লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের জন্য। ঠিক তেমনই আজও এই ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের জন্য মুসলমানের কোনও দায় নেই, যেটুকু দায় আছে সেটা হল ভবিষ্যৎ মুসলমান ভারতের জন্য। সিপিএম-এর মার্ক্সবাদী রেজ্জাক মোল্লা, জমিয়ত-এ-উলেমায়ে হিন্দ্ এর সিদ্দিকুল্লাহ, মাইনরিটি ফোরাম এবং কংগ্রেসী আইনজীবী ইদ্রিস আলি সহ সকল মুসলমান মুখপাত্র, নেতা এবং নেত্রী মাত্রই প্রত্যেকেরই একই চিন্তা এবং ভাবধারা মহম্মদ আলি জিন্নাকে অনুসরণ করা। সেদিন যেমন সকল মুসলমান মহম্মদ আলি জিন্নাকে সমর্থন করেছিল। আজও সকল মুসলমান রেজ্জাক মোল্লা, সিদ্দিকুল্লাহ, ইদ্রিস আলিদের সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে।

আর তাই-ভারত সরকার যদি পরিবার পরিকল্পনার কথা বলে তবে এরা বলে-মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে যাও। ভারত সরকার যদি বলে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে হবে তবে এরা বলে মুসলিম অনুপ্রবেশ বাড়াতে না পারলে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার হার দ্রুত বাড়ানো যাবে না। তাই মুসলিম অনুপ্রবেশ চালিয়ে যাও। ভারত সরকার যদি সর্বশিক্ষা অভিযানের কথা বলে তবে এরা মাদ্রাসা শিক্ষার কথা বলে। ভারত সরকার যদি সকল ভারতবাসীর জন্য কোনও আইন তৈরি করে তবে এরা আলাদা মুসলিম আইন ছাড়া মানে না। সুতরাং মুসলমানদের জন্য আলাদা করে ভাবতে হবে। আগামী দিনে ভারত যে আবার একটা মুসলমান ভারত হতে চলেছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। গোটা ভারতবর্ষ যদি মুসলিম জেহাদির দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং হাজার হাজার নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয় তবে, ভারতের মুসলমানদের কোনও প্রতিবাদ দেখা যায় না। কিন্তু ইস্রায়েল যদি গাজা ভূখণ্ডে বোমা ফেলে এবং সেখানে যদি কোনও মুসলমানের মৃত্যু হয় তবে প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় মুসলিমদের উদ্যোগে ধর্মঘট পালিত হয়।

আমরা হিন্দুরা যদি সমবেত হয়ে দুর্গকেন্দ্রিক হিন্দু এলাকা গড়তে না পারি এবং পুজোর নামে আড়ম্বর ও কুসংস্কার ত্যাগ না করি, মন্দির প্রাঙ্গণে নিয়ম করে এসে হিন্দু যুব সমাজ যদি হিন্দুর অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা এবং সমাধানের রাস্তা না বের করতে পারি তবে হিন্দুরাই বিলুপ্ত হবে।

—বিজয় দে, লেনিননগর, ডায়মণ্ডহারবার, দঃ ২৪পরগণা।

শিবস্থানে কবরস্থান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের ঘোষণা—দেশের সম্পদের উপর প্রথম অধিকার মুসলমানদের—নিছক কোনও সাধারণ কথা নয়, এটি ভারতবর্ষের ভবিতব্য। তাঁর মতো সকল নেতাকেই ভবিষ্যতে বাধ্য হতে হবে অধিকার ছাড়তে। বর্ধমান জেলার জামালপুর থানা এই ঘোষণার বহু আগেই এর তাৎপর্য অনুভব করেছে। বিষ্ণুবাটি মৌজায় শ্রীশ্রী জয়চণ্ডী ঠাকুরাণী ও শ্রীশ্রীবীরেশ্বর শিবের দেবোত্তর জমিতে কবরস্থান সংক্রান্ত এক বিরোধে ১৯৭৪ সালে মহামান্য আদালত কবরস্থানের অস্তিত্ব নামঞ্জুর করেছে। তথাপি ওই জমির একাংশে স্থানীয় মুসলমানরা জোরপূর্বক কবর দিয়ে এসেছে। গত ২০০৮ সালে তারা বাকি অংশেও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু স্থানীয় কয়েকজন নির্ভীক যুবক এই আগ্রাসনের প্রতিবাদে গ্রামবাসীদের সংগঠিত করেন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে জামালপুর থানা ও ব্লক প্রশাসনকে চাপ দেন। বহু আলোচনা, বিবাদ-বিসম্বাদ, বিতর্ক, হুমকি নিষ্ফল হয়ে গেছে মুসলিমদের একরোখা মনোভাবে। তবে প্রশাসনের পরোক্ষ মদত সত্ত্বেও তারা জমির দখল নিতে পারেনি আইনি সমর্থন না থাকায়। অন্যদিকে বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বিষ্ণুবাটি গ্রামের সাধারণ মানুষ ওই জমিতে অধিকার হারাচ্ছে এক সর্বনাশা মুখোশধারী উদাসীনতায়, যাকে প্রকারান্তরে ভীরুতা বলা যেতে পারে। শেষপর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় আছে। ওয়াকফ্ বোর্ডে বিষয়টি নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইত্যাদি। আপনার পত্রিকার মাধ্যমে প্রশাসনকে সংবাদের সত্যতা অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আবেদন জানাচ্ছি।

—সুকান্ত আওন, জামালপুর, বর্ধমান।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে

পশ্চিমবঙ্গে ৮১টি পুরসভার নির্বাচন আসন্নপ্রায়। বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এই নির্বাচন সেমিফাইনাল খেলার সঙ্গেই তুলনীয়। তবে রাজ্যের শাসকদল তথা বামফ্রন্ট এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো। কারণ বিভিন্ন নির্বাচনে পর্যুদস্ত হবার পর আবার একটা নির্বাচনের সম্মুখীন হয়ে যেন হালে পানি না পাবার মতো অবস্থা। তাই দ্বিধাগ্রস্ত সিপিএম তথা বামফ্রন্ট ছলে-বলে-কৌশলে সাধারণ মানুষের মন জয় করতে স্বাভাবিক ভাবেই উদ্যত হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্প্রতি শিল্প গড়তে একফসলি জমি বা উর্বর কৃষিজমি নেওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বের আগে এই চিন্তাধারা থাকলে সাধারণ কৃষকরা উপকৃত হতেন না কি? অবশ্য বাম নেতাদের বিলম্বে বোধোদয় নতুন কিছু নয়। যেমন প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দিয়ে আবার তা প্রাথমিকের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তি করা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সঙ্গেই তুলনীয়। তবে উর্বর চাষযোগ্য জমিতে শিল্প না গড়ার মন্তব্য একটা নির্বাচনী ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়। এতদিন এঁরাই উর্বর চাষের জমিতে শিল্প গড়ার জোরদার সওয়াল করতেন। হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর নাটকীয় পটপরিবর্তন কি সাধারণ মানুষকে ভাঁওতা দেওয়ার সামিল নয়? আসলে রাজ্যে শিল্পায়নকে হাতিয়ার করে এরাজ্যে যাবতীয় নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার স্বপ্ন দেখেছিল সিপিএম তথা বামফ্রন্ট। কিন্তু রাজ্যে অনেক কলকারখানা বন্ধ, রুগ্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মসংস্থানের অভাবে দিশেহারা সেখানে রাজ্যে শিল্পস্থাপনের ভবিষ্যৎ কি তা সহজেই অনুমেয়। শিল্পের নামে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার অভিনব কায়দা সাধারণ মানুষের কাছে আর অজানা কিছু নয়। তাই শিল্পের জন্য উর্বর চাষযোগ্য জমি না নেওয়ার মন্তব্যে কৌশলসর্বস্ব রাজনীতিই যে কাজ করছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে অভিনবত্ব নেই। এটা মানুষের আস্থা অর্জনের নির্মম পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু জানা দরকার ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা হুগলী।

দুটি সংস্কৃতি, একটি দ্বন্দ্ব

প্রাক বিধানসভা নির্বাচনের সন্ধিক্ষণে পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে বিভেদ ও বিচ্ছেদের সুর বাজছে। বৃটিশের শাসনকার্যের মূল নীতিগুলি ও নির্বাচনের চিরন্তনী মূলধন বিভেদ-বিচ্ছেদ ক্রমে ধ্বনিত হচ্ছে। যদিও এই বিভেদ ও বিচ্ছেদ একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায় অর্থাৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই। বিগত নির্বাচনের ফলাফলগুলিতে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তা কি কেবল সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের জন্যই? না, তা নয়। অথচ এক শ্রেণীর বাজারি সংবাদপত্র ও মাধ্যম তা পরিকল্পিতভাবেই হোক বা তাদের অজ্ঞতার জন্যই হোক প্রচার করে এই রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর পরিণাম অতীতের পাতা থেকে বিশ্লেষণ করা যাবে পারে।

এখন দেখা যাক, রাজ্যে এই সাম্প্রতিক পরিবর্তনের কারণ কি কি? প্রথম কারণ পারমাণবিক (আমেরিকার সাথে ভারতের) চুক্তি বিতর্কে চীনের অঙ্গুলি হেলনে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বামপন্থীদের সমর্থন প্রত্যাহারের দরুণ কংগ্রেসের সি পি এমকে একটা শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প, দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের শাসনে অহং মনোভাবী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে Anti establishment wave, শিল্পের নামে কৃষিজমি জোরপূর্বক অধিগ্রহণ ও তার বিরুদ্ধে, সুবিশাল সমাজের জাগরণ, চরম দিশাহীন বেকারত্ব, ও সর্বোপরি, নন্দীগ্রাম সহ সিঙ্গুরে পুলিশ ও ক্যাডার বাহিনীর যৌথ অত্যাচারের দৃশ্য গণমাধ্যমে প্রতিফলিত। এই কারণগুলোই বর্তমান পরিবর্তনে অনুঘটকের কাজ করছে। এতে সংখ্যালঘু, সংখ্যালঘু করে চেঁচিয়ে তাদের ভূমিকা বড় করে দেখানোর দুরভিসন্ধিটা কি? এই বিভেদ থেকে বিচ্ছেদের মানসিকতা গড়ে তোলা হচ্ছে না কি? সংখ্যালঘুদের মধ্যে যে দুটি ভিন্ন বিবদমান সংস্কৃতি আছে তাকে অস্বীকার করি কী করে?

বৃটিশ শাসনাধীনে এইরকম ভাবেই সংখ্যালঘুদের একটা ট্রঙ্গপ্লক্ষক্সব্দনন্ধ ঠনন্ধত্তজন্দ্ব দান করা হয়েছিল; যার ফলে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান ও দানবীয় আস্ফালনে কলকাতা ও নোয়াখালিতে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছিল। অথচ, এর মধ্যে যে ধারাটি সকলের অলক্ষ্যে প্রবাহিত হয়েছিল তা হলো পশ্চিমী আরব প্রধান উর্দুভাষী ধর্মীয় শক্তির জয়যাত্রা। বাংলার বাঙালী মুসলিম ধর্মের ও ইসলামী সংস্কৃতির মূলে এটা কুঠারাঘাত ছিল। তবে কি বলা যায় না—বর্তমানের পরিবর্তন পাল্টা সংখ্যালঘুরা 'আরব শিশু' নয়; বরং তারা বাঙালী সংখ্যালঘু। পূর্বের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অংশগ্রহণকারীরা অধিকাংশই 'আরব শিশু' ছিল। বর্তমানে তসলিমা বিতাড়নের জন্য কলকাতার মহড়া কি তাদের নয়? রাজ্যের দুই মন্ত্রী কি আরবী ও বাঙালী ধর্ম ও সংস্কৃতির দুটি মুখ নয়? সেইজন্য কি আশা করবো না যে বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতিকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে আরব প্রধান মুসলিম সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে।

বাংলাদেশে যেটা শুরু হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান অবস্থাতেই, এবং সফল হয়েছিল ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা ও হাসিনার বর্তমান মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে। এ বাংলাতেও এমনি সময় এসেছে হাসিনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতিকে রক্ষার। মন্ত্রী মহোদয়কে (রেজ্জাক মোল্লা) ঘোষণা করতে হবে—বাঙালী/মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ নাকি আরব শিশুদের জন্য সংরক্ষণ— কোনটা চাই? আবার বাঙালী মুসলিম লেখিকা তসলিমা তার লেখনী নিয়ে বিচরণ করুক অবাধে উভয় বাংলায়। কেননা, আপনি তো বাঙালী ও উর্দুভাষী দুটি সংস্কৃতির একটি মুখ নন। সেলিম সারেরও তো একটি মুখ আছে(আরব সংস্কৃতির)।

সুতরাং বলা যায়, বাংলার সমস্যা যেমন সি পি এম; তেমনই আরব শিশুরা। আর, এই আরব শিশুদের কান্নাই মহাদানবের প্রলয় নৃত্য সূচিত করছে।

—শিবাশীষ রায়চৌধুরী, ধুবুলিয়া, নদীয়া।

মণিলাল বসু

সম্প্রতি আমাদের ছোটদের পরম প্রিয় 'মণিদা', বড়দের স্নেহভাজন 'মণিলাল', আর সর্বজনের আপনজন 'মণিলাল বসু' পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কোনরকম উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, বিরক্তি না দিয়ে নীরবে, নিভৃতে অমৃতলোকে চলে গেলেন। এই ধরনের নিবেদিত কর্মীর অকস্মাৎ প্রয়াণের সামান্য উল্লেখ কোনও ধরনের 'মিডিয়ায়' দেখা গেল না! অর্থ, আড়ম্বর, রুচি প্রচার মাধ্যমকে কিভাবে গ্রাস করেছে, এই ঘটনার অনুল্লেখ তারই আরেকটা প্রমাণ! 'স্বস্তিকার' কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। সেখানে 'মণিদার' পরিচয় সংক্ষিপ্তাকারে যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

'মণিদার' সঙ্গে আমার পরিচয় শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন (ব্রাঞ্চ) স্কুলে। এখানেই সহকর্মী হিসেবে 'মণিদাকে' পাই এবং আশ্চর্যভাবে 'মণিদা' এই কনিষ্ঠ শিক্ষককে আপন করে নেন। তারপর থেকে দীর্ঘদিন মণিদা নানাভাবে আমার প্রতি অকুণ্ঠ স্নেহ-ভালবাসা দেখান, প্রয়োজনে সু-পরামর্শ দেন। এই সময় দেখেছি শুধু ছাত্রদের পাঠদান ব্যাপারে নয়, বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এসে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন 'দাদা।' প্রসঙ্গত মনে পড়ে যাচ্ছে সেই সময় জনৈক শ্রদ্ধেয় প্রবীণ শিক্ষকের সার্ভিসের কাগজপত্তর ওই শিক্ষকের হাবড়ার পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বারেবারে গিয়ে যথাযথ সংশোধন করে আনেন। ফলে ওই শিক্ষক মহাশয়ের পেনসন পাওয়া সম্ভব হয় যা তিনি পরে অকুণ্ঠ, কৃতজ্ঞচিত্তে বারেবারে স্বীকার করে গেছেন।

শিক্ষা ও শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারের বাইরে সেবামূলক কাজ, বিদ্যাচর্চা ও রাজনৈতিক বিষয়ে 'মণিদার' ছিল সমান আগ্রহ, সংবাদপত্র পড়তেন অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় মত-পার্থক্য হলেও কখনও বন্ধুর প্রতি আক্রমণাত্মক হননি! এমনই অত্যাশ্চর্য সহনশীল মনোভাব ছিল এই 'প্রকৃত' বিদ্যার্থী-শিক্ষকের। এই আচরণই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। কেননা তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে ভারতীয় শিক্ষাসংস্কৃতি ধারক-বাহক। যার মূলে কথা পরধর্ম ও পরমতসহিষ্ণুতা।

পরবর্তীকালে গুণের মর্যাদায় 'মণিদা' পার্শ্ববর্তী শিবপুর শিক্ষালয়ে প্রধান শিক্ষক হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু এই স্কুল-পরিবর্তনে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ আমার ছিন্ন হয়নি। সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। লক্ষ্য করেছি এখানেই আগের মতই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বৃত্তিগত আন্দোলনেও 'মণিদার' ভূমিকা বলিষ্ঠ ও অপূরণীয়। তার বিবরণ স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়! তাই পরিশেষে বলি, 'মণিলাল বসু' প্রকৃতই নিবেদিত, নিরভিমান, বিরল সমাজ-কর্মী— এই ভাবের নতুন মানুষ পাওয়া খুবই দুর্লভ।

—রণজিৎ সিংহ, সিঁথি কলকাতা।

দক্ষিণের অনুকরণে দিল্লীতে স্বামীমালাই মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দিল্লীর বসন্ত বিহারের রাস্তার উপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়বে মালাই মন্দিরের পরিসর। মালাই মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সত্যিই অপরূপ। মন্দিরের পাঁচিলটি রঙ করা হয়েছে সবুজ এবং নীল রঙ দিয়ে। ফলে পাঁচিলটি দেখে মনে হয়, কার্তিকের পায়ের নীচে যেন বসে থাকা ময়ূর। মন্দিরের এক যুবক পুরোহিত মন্দির সম্বন্ধে এই তথ্যটি আমাদের জানালেন। কার্তিক মানে ভগবান শিব ও দেবী পার্বতীর দ্বিতীয় পুত্র। দেবী পার্বতীকে এখানে অনেকে সুব্রমনিয়ম, স্কন্দ, এবং তাঁর ছ-টি মুখ বলে তাঁকে সনমুখাও বলে থাকেন।

এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন স্বামী রাস স্বতমিগাল। তাঁর নামেই এই মালাই মন্দির। আবার অনেকে এই মন্দিরটিকে উত্তরা স্বামীমালাই বা শুধু স্বামীনাথ মন্দির বলেও জানেন। এই মন্দিরটি গঠন করা হয়েছে সাতটি পাদাই-এর অনুসরণে (ভগবান শিবের ভক্তিমূলক গান)।

দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের আদলে মালাই মন্দিরটি গঠন করা হয়েছে। এই মন্দিরের কারুকার্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে দক্ষিণী ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। এই মন্দির সম্বন্ধে দর্শনার্থীদের ব্যাখ্যা—মালাই মন্দিরটি দক্ষিণী স্বামীমালাই মন্দিরের আদলেই তৈরি করা হয়েছে। মন্দিরের মালাই নামকরণের কারণ মন্দিরটি তৈরি হয়েছে একটু উঁচু স্থানের উপর। আর তামিল ভাষায় উঁচু স্থানকে মালাই বলা হয়।

বছর ৩৩ এর সোহানলিকা এমন একজন ভক্ত যিনি বিগত দশ বছর ধরে প্রতিদিন এই মন্দিরে আসেন। এই মন্দিরে এসে ভগবানের দর্শন করেই তার দিন শুরু হয়। তার মতে তিনি যে একজন সামান্য মেয়ে হয়ে এম সি এ-র মতন ডিগ্রি পেয়েছেন ও এক বহুজাতিক সংস্থায় চাকুরিরত, তার কারণ ভগবান কার্তিকের আশীর্বাদে এসব কিছু সম্ভব হয়েছে। সোহানলিকার বিশ্বাস ভগবান কার্তিক হলেন যুদ্ধের দেবতা। যে ব্যক্তি তাকে প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গে স্মরণ করেন সে যে কোনও বিপদেই পড়ুক না কেন ভগবান তাকে ঠিক রক্ষা করেন। হিন্দুরা নিজেরাই দেব-দেবী সৃষ্টি করেছেন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেব-দেবী পূজিত হয় যেমন গণেশ ঠাকুর যিনি দুষ্ট শক্তির দমন করেন।

ভগবান কার্তিক এক হাত দিয়ে দুষ্টের দমন এবং শত্রু নাশ করেন এবং অপর হাত দিয়ে তাঁর আপামর ভক্তকে আশীর্বাদ প্রদান করেন।

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আর. ভেঙ্কাটরমন এই মন্দিরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই মন্দিরটি তৈরিতে মোট খরচ হয়েছে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। এইটি ভারতের এমন একটি মন্দির যাতে ব্রহ্মাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত এম বৈদ্যনাথের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে মহাভারতে ভগবান কার্তিকের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র এই মন্দিরেই স্থাপিত আছে সর্ববশীকরণ যন্ত্র। ভগবান স্বামীনাথের মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে ৯০০টি বড় পাথরের চাঁই দিয়ে। যেগুলির ওজন ছিল প্রায় চার থেকে পাঁচ টন। এই মন্দির নির্মাণে কোনও সিমেন্ট বা বালির ব্যবহার করা হয়নি।

দিল্লী পি ডব্লু ডি সংস্থায় ইঞ্জিনীয়ার পদে চাকুরিরত বছর ৪৭-এর কুমার ভেঙ্কটেশওয়ারলু এই মন্দিরের আর এক ভক্ত যিনি রোজ এই মন্দিরে আসেন। তার মতে মালাই মন্দিরটি হলো সাধারণ মানুষের কাছে এক তীর্থক্ষেত্রের মতো এবং ভগবান কার্তিক এখানে সবার মনে বিরাজ করেন।

কেরলে বালগোকুলমের কৃষ্ণয়ণম ২৪০০০ শিশুদের মহাসম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ৩ এবং ৪ এপ্রিল কেরলের ঐতিহাসিক নগর ত্রিশূরে কৃষ্ণয়ণম—২০১০ নামে এক আন্তর্জাতিক মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল। এই মহোৎসবের উদ্যোক্তা বালগোকুলম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাকে সামনে রেখে শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য কেরলে এই সংগঠনের সূচনা হয়। কে আর রঙ্গাহার এর অন্যতম উদ্যোক্তা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ২৪০০০ শিশু এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ ত্রিশূরের ইতিহাসে এই প্রথমবার এত বেশি সংখ্যায় শিশুরা কোনও অনুষ্ঠানে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে।

স্থানীয় বডকুন্নাতন মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই সমারোহের শোভা ছিল অতি মনোরম। ১০০টি সুসজ্জিত হাতী, অসংখ্য রঙ-বেরঙের ছাতা, হাজারের উপর লোক এবং শিশুদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটিকে যেন এক আনন্দযজ্ঞে পরিণত হয়েছিল। হাতীদের কোমর দুলুনি হাঁটা, বহু বর্ণময় বিচিত্র ছাতার প্রদর্শন এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা শিল্পীদের নানা রকমের অনুষ্ঠান ছিল এই উৎসবের অঙ্গ। এই ঐতিহাসিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চেন্নাই-এর রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রমুখ স্বামী গৌতমানন্দজী। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে মাল্যদান করে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে স্বামী গৌতমানন্দজী বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবার কাছেই এক উত্তম আদর্শ। তাঁর প্রেরণায় আমরা জীবনে এগিয়ে চলার রাস্তা খুঁজে পাই। গৌতমানন্দজীর মতে ১০০০ বৎসরের পরাধীনতার ফলে আমরা নিজস্ব মূল্যবোধ, নিজস্ব সংস্কৃতি, এবং সনাতন ধর্মের প্রতি যে কর্তব্য তা ভুলতে বসেছি। স্বাধীনতার ষাট বছর পরেও আমরা নিজেদের শিশুদেরকে আত্মকেন্দ্রিক করে গড়ে তুলছি। তাদেরকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা অত্যন্ত দরকার এবং ভারতীয় মহাপুরুষদের যেমন, শ্রীরাম, ঋষি অরবিন্দ, ছত্রপতি শিবাজী, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীদের প্রতি শিশুদের মনে শ্রদ্ধাভাব জাগানো প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানের প্রধান পদ্মশ্রী পি পরমেশ্বরণ বালগোকুলমের প্রশংসা করে বলেন, ১৯৬৩ সালে কেরলে এই সংস্থাটির প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। আজ ভারত ছাড়া আমেরিকা এবং ইউরোপেও সংস্থাটির শাখা রয়েছে।

এই মহোৎসবের সমাপ্তি ঘটে ৪ এপ্রিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রচারক প্রমুখ মদনদাস দেবী এবং বিচারপতি রাধাকৃষ্ণন মেনন বিশেষ অতিথি রূপে এই সমারোহে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০০ শিশু বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শকদের সামনে প্রদর্শন করে। এছাড়া আলো এবং ধবনির মাধ্যমে ভারত দর্শন নামে এক কার্যক্রম সাধারণের সামনে শিশুরা তুলে ধরে যাতে ভারতের প্রাচীন এবং বর্তমান সংস্কৃতির মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। মণিপুরী, ওড়িশী, কত্থক, ভারতনাট্যম, কথাকলি প্রভৃতি ধারার নৃত্য এইসব শিশুরা পরিবেশন করে যা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে।

কানপুরে ৩০০০ বছরের প্রাচীন স্থাপত্যের সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উত্তরপ্রদেশের কানপুরে জাজমাউ পাহাড়ি টিলার কাছে উত্তরপ্রদেশের রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ (ইউ পি এস এ ডি) এক বিরাট সাফল্যের মুখ দেখেছে। ইউ পি এস এ ডি-র দাবী—প্রায় তিন হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের তারা সন্ধান পেয়েছেন যা ভারত ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

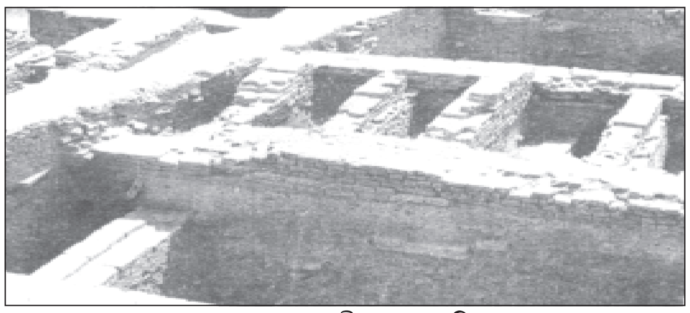

কানপুরে প্রাপ্ত প্রাচীন সভ্যতার চিহ্(।

প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে জাজমাউ টিলার কাছে খনন কার্যের ফলে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে তা মূলত মৌর্য বংশের আগের থেকে শুরু করে কুষাণ সভ্যতা অবধি বিস্তৃত। প্রত্নতত্ত্ববিদদের দৃঢ় বিশ্বাস যে খননকার্য সঠিক প্রকারে চললে প্রায় চার হাজার বছরের পুরোনো নিদর্শনও এই স্থান থেকে পাওয়া যেতে পারে। ইউ পি এস এ ডি বর্তমানে টিলা সংলগ্ন ১,৭০০ বর্গমিটার অঞ্চ ল জুড়ে খনন কাজ চালাচ্ছে। পরবর্তীকালে সাড়ে চার হাজার বর্গমিটার অঞ্চ লে এই খনন কাজ হবে। কিন্তু একইভাবে জাজমাউ নদীর উপর সেতু তৈরির ফলে বিখ্যাত জাজমাউ টিলাটি পুরোপুরি ভাবে ধবংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। খনন কার্যের ফলে যে সব তথ্য প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছে উঠে এসেছে সেগুলি হলো তখনকার সময়ে শহরগুলি খুবই সুন্দর ভাবে পরিকল্পনা মাফিক গঠন করা হয়েছিল এবং সেইসব শহরে নর্দমা, রাস্তাঘাট, শস্যগোলা, সকলরকম উন্নততর সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত এখানে ছিল। মাটি ও পোড়া ইট দিয়ে তৈরি ঘর, রান্নাঘর এবং স্নানের জায়গার বর্ণনা প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাছ থেকে জানা গেছে। আবার মুদ্রা, টেরাকোটার মূর্তি এবং কুম্ভকারশালার (পটারি) নিদর্শন এই ধবংসস্তূপ থেকে পাওয়া গিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের মতে মৌর্য বংশের তুলনায় কুষাণ বংশের নগর সভ্যতা অনেক বেশি উন্নততর ছিল। ইউ পি এস এ ডি প্রতিনিধিদের বক্তব্যে কুষাণ যুগ এতটাই উন্নত ছিল যে এক টন মতন শস্য জমা করে রাখার মতন ভাঁড়ার ঘর তাদের ছিল। রেডিও কার্বন-ডেটিং পদ্ধতির মাধ্যমে জাজমাউ-এর ঐতিহাসিক নিদর্শনের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ইউ পি এস এ ডির নির্দেশক রাকেশ তিওয়ারির মতে মুদ্রা ও শস্যবীজ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে যে সব তথ্য উঠে এসেছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই খনন কার্য ভারতের সাধারণের মানুষের কাছে বহু অজানা তথ্যকে তুলে ধরবে।

এই খননকার্য যে নিদর্শন উদ্ধার হয়েছে বিশেষজ্ঞদের মতে তা মৌর্য বংশের সময়কালকে নির্দেশ করে যা প্রায় ৩২২ থেকে ১৮৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ আগেকার।

মেয়েদের হীনমন্যতাই অসাফল্যের কারণ ঘটায়

অঙ্গনা

অরুণা মুখোপাধ্যায়

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে বর্তমান নারীপ্রগতির যুগেও এমন অনেক অল্প শিক্ষিতা মেয়ে আছেন যারা শিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে বিশেষ হীনমন্যতায় ভোগেন ও নিজেদের উপর আস্থাহীনতার ফলে জীবনের জটিল ক্ষেত্রে বাস্তব পৃথিবীতে ভুল করে বসেন। তাই তাদের জীবন সফল হয় না। মনে পড়ছে একটি ১৭/১৮ বছরের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অল্প শিক্ষিতা মেয়ের কথা। মেয়েটির শৈশবে একটি চতুর বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন বেকার ছেলে স্কুলে পঠনরত অবস্থায় তার কাছে প্রেম নিবেদন করে ও বিয়ের জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করে। মেয়েটি মনে করে ছেলেটি মেয়েটির অপেক্ষা অনেক সুযোগ্য ও নিজের হীনমন্যতার কথা ভেবে ছেলেটির প্রস্তাবে রাজি হয়ে মা বাবার কাছে জানিয়ে দেয় যে ওই পাত্র ছাড়া সে বিয়েই করবে না। অথচ সেই বেকার পাত্রের মা বাবা ছেলেটির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেনি ছেলেটির বদ্‌স্বভাবের জন্য ও অলসতার কারণে। স্বল্পবুদ্ধি হীনমন্যসম্পন্না মেয়েটি কিন্তু ছেলেটিকে আদর্শ পুরুষ মনে ক'রে মা বাবাকে রাজি করিয়ে বিয়ে করে ও পরবর্তীজীবনে ওই স্বামীর দ্বারা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারগ্রস্ত হয়ে বাপের বাড়িতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়। যদিও তার বাবার প্রদত্ত সামান্য গয়নাগাটি ও শাড়ি, জামা ও

নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু ছেলেটি আটকে রাখে। মেয়েটি কিন্তু ইতিমধ্যে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। স্বামীকে বহুবার চিঠি দিয়ে জানিয়েও ফল হয় না। ছেলেটি বলে—'আমি নতুন বিয়ে করবো দু-এক দিনের মধ্যেই।' নির্বোধ মেয়েটি তার নিজের উপর আস্থাহীনতার কারণে ওই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হেসে উড়িয়ে দেয় ও আইনজীবীর পরামর্শও নেয় না। পরে শুনেছিলাম মেয়েটি নিজের জীবন মনের দুঃখে নষ্ট করেছিল বিষজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করে। তাই মনে হয়, মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষা পুঁথিগত নয়, চরিত্র গঠনের শিক্ষাই মায়েদের দেওয়া কর্তব্য। স্বামীজীর প্রদত্ত শিক্ষা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—মেয়েরা এমনভাবে শিক্ষিত হবে যে তাদের নিজেদের সমস্যা তারা যেন নিজেরাই মেটাতে পারে।

আর একটি ঘটনা মনে পড়ছে। রাস্তার ধারে ঝুপড়িতে বসবাসকারী একটি বিবাহিতা মেয়ে তার স্বামী ও দুটি পুত্র নিয়ে বসবাস করতো। স্বামী ট্রাক চালায় ও তাদের সংসার মোটামুটি ভাবে চলে যায়। একদিন এক দুশ্চরিত্র সাধুবাবার ওই মেয়েটির উপর কু-দৃষ্টি পড়ে ও সে তার স্বামীর অসাক্ষাতে নির্বোধ, হীনমন্যধারী মেয়েটিকে বলে যে ওই সাধুর ভক্তদের দেওয়া বহু জমির মধ্যে কিছু জমি ওই দরিদ্র মেয়েটিকে দিতে ইচ্ছুক; যেহেতু এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা যে ওই মেয়েটিও কিছু জমি লাভ করুক। এবার কোর্ট পেপার এনে আদালত থেকে অশিক্ষিতা মেয়েটিকে দিয়ে হলফনামা করতে বলে ওই সাধু। মেয়েটি তার স্বামীর অসাক্ষাতেই সরল বিশ্বাসে মনের আনন্দে হলফনামা করে দিয়ে আসে। ওই হলফনামা কিন্তু মিথ্যার ভিত্তিতে হয়। অর্থাৎ ওইটিতে লেখা ছিল যে, ওই সাধু মেয়েটি ও তার দুই ছেলেকে নিয়ে একত্রে থাকে (স্বামীর নাম লিখিত থাকে না) ও এই জমি সাধু মেয়েটিকেই দিতে চায়। অর্থাৎ এথেকে বোঝা যায় যে মেয়েটি সাধুর রক্ষিতা ও মেয়েটির সঙ্গে সাধুর অবৈধ সম্পর্ক। মেয়েটিকে লেখার মর্মার্থ বলাতে মেয়েটি কাঁদতে থাকে ও বলে যে সে ওই সাধুকে বিশ্বাস করেছিল এবং সেই কারণেই স্বামীকে জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। পরবর্তীকালে অবশ্য আইনজীবীর সহায়তায় মেয়েটি রক্ষা পেয়েছিল।

তাই মনে হয় বাস্তবজীবনে মেয়েদের বাস্তববুদ্ধি প্রয়োগের শিক্ষা তাদের থাকা উচিত যার দ্বারা মেয়েরা অল্পশিক্ষিতা অথবা নিম্নমধ্যবিত্ত হলেও হীনমন্যতার প্রভাব অথবা বিপদ থেকে রক্ষা পাবে।

।। চিত্রকথা ।। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।। ৯

মহাপ্রভু বৃন্দাবনে পৌঁছে কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে পাগল হয়ে কীর্তন করতে লাগলেন। বিস্মিত ব্রজবাসী।

মহাপ্রভুর সংস্পর্শে এসে পাঠান সর্দার বিজলী খান ভগবৎভাবে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। হরিনাম কীর্তন করতে থাকলেন।

যমুনার নীল জল দেখে কৃষ্ণ প্রেমে উদ্বেল হয়ে উঠে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। বল্লভাচার্য অতি কষ্টে তাঁকে জল থেকে নৌকায় তুললেন।

গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর-এর সৌজন্যে। (চলবে)

গয়েশপুরে ধাক্কা খাবে বামফ্রন্ট

ধীরেন দেবনাথ।। নদীয়ার লালদুর্গ গয়েশপুর একদা ছিল 'নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি'র অন্তর্গত। বছর ১৫ আগে গয়েশপুর পেয়েছে পুরসভার মর্যাদা। প্রথম থেকে আজ অবধি বামফ্রন্টের দখলে রয়েছে পুরবোর্ড। বর্তমান পুরবোর্ড বিরোধী শূন্য। এখানকার লাল সন্ত্রাস একদা বিরোধীদের রাজনৈতিক তৎপরতাকে করেছে প্রতিহত। যে কোনও নির্বাচন পরিণত হোত প্রহসনে। বিরোধী ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। তাদের ভোট দিয়ে দিত ক্যাডাররা। আবার নিজেদের দলের সন্দেহভাজনদের ভোট দিতে হোত ক্যাডারদের সামনে। তবে বিরোধীহীন, এজেন্টহীন, প্রতিবাদহীন ভোট হোত নির্বিঘ্নে—শান্তিপূর্ণভাবেই। বাইরে থেকে নীরব ভোট-ডাকাতির কেউ সন্ধানই পেতেন না।

এলাকাটি উদ্বাস্তু অধ্যুষিত। ৯৫ শতাংশই উদ্বাস্তু। নাগরিকদের অধিকাংশই বামপন্থী। উদ্বাস্তুদের অভাব-অনটনের সুযোগ নিয়ে এবং তাঁদের ভুল বুঝিয়ে সিপিএম এখানে সমর্থক বাড়াতে সমর্থ হয়েছে এবং সেই সুবাদে গড়ে তুলেছে লালদুর্গ। তবে বিগত লোকসভা নির্বাচনে প্রশাসনিক কড়াকড়ির জন্য সিপিএম প্রকাশ্য রিগিং ও জালিয়াতির তেমন সুযোগ পায়নি। তাই তাদের ভোট কমেছে যথেষ্ট। তবুও পরিবর্তনের হাওয়াতেও এই পুরসভায় লিড নিয়েছে বামফ্রন্ট। বিরোধী হাওয়া এখানে এসে থেমে গেছে। তবে লোকসভার সিট হারিয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গে সার্বিক ভোটবিপর্যয়ে এখানকার সিপিএম এখন যথেষ্ট মনমরা ও আতঙ্কিত। অন্যদিকে এখানকার বিরোধীরা যথেষ্ট উজ্জীবিত। সিপিএমের হীনমন্যতা ও প্রবল গোষ্ঠি দ্বন্দ্বে বিরোধীদের 'মরাগাঙে এসেছে জোয়ার'। তাঁরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কোমর বেঁধে।

১৮টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট গয়েশপুর পুরসভা। পুরভোট নির্বিঘ্নে হলেও গয়েশপুর পুরবোর্ড বামফ্রন্টের দখলে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আর তাহলে, নদীয়া জেলার ৭টি পুরসভার মধ্যে গয়েশপুরই থাকবে বামফ্রন্টের দখলে। তবে এবার পুরবোর্ড আর বিরোধীশূন্য হবে না বলেই পুরবাসীদের ধারণা। বিরোধীরা এবার এখানে খাতা খুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং আশাবাদী। তাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে জোটধর্ম মেনে তাঁরা দাঁতে দাঁত কামড়ে নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছেন। বিনা যুদ্ধে তাঁরা জমি ছাড়তে নারাজ। ফলে এখানে লড়াই জোরদার বলে হবে মনে হচ্ছে। এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যাচ্ছে, তাঁদের মধ্যেও রয়েছে যথেষ্ট ক্ষোভ। সিপিএমের পার্টিবাজি, বঞ্চনা, নেতাদের 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হওয়া, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, রাজনৈতিক নির্যাতন তো আছেই—আছে অনুন্নয়ন, জলের অভাব, বেকারত্ব ও আইন-শৃঙ্খলার শিথিলতা। আর এসবই হচ্ছে বিরোধীদের প্রচারের হাতিয়ার। সিপিএম অবশ্য বিরোধীদের কোনও প্রশ্নের জবাব দিতেই নারাজ। তারা এলাকায় বিরোধীদের রাজনৈতিক অস্তিত্বও স্বীকার করে না।

একদা গয়েশপুরে বিজেপি-র ভালো সংগঠন ও কর্মী-সমর্থক ছিলেন। কিন্তু ইদানীং সেই সাংগঠনিক শক্তি আর নেই। তবুও তাঁরা নির্বাচনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চলেছেন। তাঁরাও খাতা খুলতে মরিয়া। তবে আপাতত সবার দৃষ্টি কুর্সির দিকে। ৩০ মে-র পরে সব কিছুরই হিসেব মিলবে।

তমলুক-কাঁথিতে মুছে যাচ্ছে সিপিএম

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ এমনিতেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে পরিবর্তনের হাওয়া। তার উপর লক্ষ্মণ শেঠের ভরাডুবি হয়েছে, সিপিএমের ওপর আস্থা রাখতে না পেরে ইতিমধ্যেই বাম কাউন্সিলারদের অনেকেই শিবির বদল করে ফেলেছেন। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো এই দুই পুরসভায় কংগ্রেস ও তৃণমূলের জোট হয়েছে। ফলে পুরভোটে প্রার্থী খুঁজতে সিপিএম দিশেহারা। গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে তমলুকে সবকটি ওয়ার্ডে বিপুল ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে তৃণমূল। তমলুকে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের ফলে ১৪ নম্বর ওয়ার্ড বর্তমানে এক নম্বর হয়েছে। গত বার এই ওয়ার্ডে জিতেছিলেন সিপিআই প্রার্থী বিধায়ক জগন্নাথ মিত্র। এবার এই ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। গতবার সিপিআই আটটি ওয়ার্ডে লড়ে দুটি আসনে জয়ী হয়। এবার তমলুকে সিপিআই মুছে যাবে বলেই সকলের ধারণা। গতবার সিপিএম আটটি আসনে লড়াই করে তিনটিতে জিতেছিল। বিগত পুরসভা নির্বাচনে তমলুকে ২২ আসনের মধ্যে বামফ্রন্ট ৫ কংগ্রেস ২ তৃণমূল ৮ ও অন্যান্যরা ৭টি আসন পায়। এবার ২০টি আসনের মধ্যে জোট করে লড়াই করছে তৃণমূল। ১৫টিতে তৃণমূল ও পাঁচটিতে কংগ্রেস প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সব থেকে বড় কৌতূহল গত বামবোর্ডের পুরপ্রধান পৃথ্বীশ নন্দীর তৃণমূলে যোগদান। সিপিএম এবার সিপিআই ও নির্দলকে বেশি আসন ছেড়ে দিয়ে কম আসনে লড়তে আগ্রহী। অন্যদিকে তমলুকের সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী ২০টি আসনেই জেতার জন্য মাঠে নেমে পড়েছেন। তার কথায় সিপিএম পূর্ব-মেদিনীপুরে মুছে যাচ্ছে। গত পুরসভা নির্বাচনে কাঁথির ১৮টি আসনের মধ্যে তৃণমূল

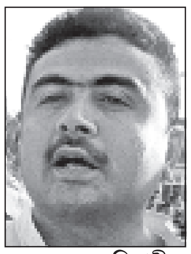
শুভেন্দু অধিকারী

পেয়েছিল ১৬ ও বামফ্রন্ট দুটি। পরে বামফ্রন্টের ২ কাউন্সিলারও তৃণমূলে যোগ দেয়। এবারও তৃণমূলই পুরসভায় জিতবে। আর কাঁথি পুরসভার চেয়ারম্যান পদে ফের শুভেন্দু অধিকারীকেই চাইছে সকলে। কিন্তু পুরভোটে প্রার্থী হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি। কারণ নিজের লোকসভা কেন্দ্রে সময় দিতে হয়, তার ওপর রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার সুবাদে জেলায় জেলায় ঘুরতে হয়। মাঝে মাঝে দিল্লিতেও থাকতে হয়। শুভেন্দু অধিকারী রাজী না হলে তস্য ভ্রাতা বিধায়ক সৌমেন্দু অধিকারীর চেয়ারম্যান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি ২০০5 সাল থেকে কাউন্সিলার এবং বর্তমানে বিধানসভার সদস্য।

মাও দমনে ভরসা সর্দার প্যাটেলের নীতিই

অরবিন্দ ঘোষ॥ গত ৬ এপ্রিল তারিখে ছত্তিশগড় রাজ্যের দান্তেওয়াড়াতে যেভাবে নক্‌শালরা ৭৬ জন সি আর পি এফ জওয়ানদের নির্মম ভাবে জবাই করল, তা জানতে পেরে একজন নেতার কথাই মনে পড়ল, যিনি থাকলে এই জঘন্য হত্যাকার্য সম্ভব হত না।

তাঁর নাম সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি শুধু স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই ছিলেন না, ছিলেন এক রাষ্ট্রপুরুষ। তিনি জীবিত থাকলে আর যদি গৃহমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী হতেন, তাহলে এই কাপুরুষ নকশালরা কোনওক্রমেই এই সৈনিকদের কচুকাটা হতে দিতেন না।

গান্ধীজীর অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী হয়েও তিনি যখন দেখলেন হায়দরাবাদের নিজস্ব ভারতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এই দেশে এক 'দক্ষিণ পাকিস্তান' নির্মাণ করার ছক ফাঁদছিলেন তখন সর্দার প্যাটেল একটি ভাষারই প্রয়োগ করেছিলেন—শক্তি।

অনেকেরই হয়ত মনে আছে যে যখন নিজাম ভারতের সাথে অসহযোগ করে তাঁর রাজ্যকে স্বাধীন ও পাকিস্তান-প্রেমী বলে ঘোষণা করেন—তাঁর রাজাকার বাহিনী হায়দরাবাদের হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাতে থাকল। তখন তিনি একটি নীতি নেন যে বলপ্রয়োগ করতে হবে এই অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে।

অনেকের হয়ত এটাই মনে আছে যে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলপ্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি সরদার প্যাটেলকে তুজন্ঙন্তন্দ্বপুস্ত ত্রব্ধন্দ্বব্দ গুলোকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করানোর জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন—একমাত্র কাশ্মীর ছাড়া। তার পরিণতিতে আমরা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের আজকের অবস্থা চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি।

সর্দার প্যাটেল ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল জে এন চৌধুরীর সাথে আলোচনা করে স্থির করেন যে সমস্যার সমাধান করার জন্য একটি মাত্র রাস্তা খালি। সেটা শক্তি প্রয়োগের। ওঁরা চুপচাপ ব্যাপারটা আলোচনা করে আক্রমণ দিনক্ষণ নিশ্চিন্ত করেন।

তারপর খুব সম্ভব ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮-এর রাত্রে অভিযান আরম্ভ হয়। সর্দার প্যাটেলকে জেনারেল চৌধুরী রাত্রে খবর দিলেন। সর্দার প্যাটেল তখন নেহরুজীকে ফোন করে জানান যে হায়দরাবাদে পুলিশ অ্যাকশান আরম্ভ হয়ে গেছে। "তবে আমি এখন শুতে যাচ্ছি। আপনিও শুয়ে পড়ুন"—নেহরুজী হতবাক কিন্তু তাঁর কিছুই করার আর উপায় ছিল না। দু-তিন দিন পরেই হায়দরাবাদ-এর নিজাম ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন-এর সাথে আগের রাজ্যের বিলয় করে দেন।

সর্দার প্যাটেলকে কাশ্মীর-এর ভার দিলেও ঠিক একই রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেত। আজ মাওবাদীদের শায়েস্তা করার জন্য দরকার আর একজন সর্দার প্যাটেল। চিদাম্বরম বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ কাজের উপযুক্ত নন। কিন্তু কোথায় সেই আধুনিক যুগের সর্দার প্যাটেল?

এবার বিশ্বকাপ মাতাবে মেসি

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।। আর কদিন পরেই শুরু হচ্ছে 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'— বিশ্বকাপ ফুটবল। অলিম্পিক যদি হয় বিশ্বসভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব তবে বিশ্বকাপ ফুটবল সর্বশ্রেষ্ঠ শো- বিজনেস। বোধহয় এজন্যই আই ও সি এবং ফিফা কখনো সর্বসম্মতভাবে এক প্লাটফরমে আসতে পারছে না। দুটি গ্লোবাল ইভেন্টের মধ্যে দু-বছরের ব্যবধান থাকছে যাতে দু'তরফই লাভবান হচ্ছে। অলিম্পিক ফুটবল থেকে পরবর্তী বিশ্বকাপ ফুটবলের নবোদিত নক্ষত্র উঠে আসছে এমন নজির মিলবে ভুরি ভুরি। যেমন হালের লায়েনেল মেসি, যিনি ২০০৪ এথেন্স অলিম্পিক থেকে উঠে এসে আজ আর্জেন্টিনার রক্ষাকবচ ও বিশ্বকাপ জেতার 'স্বপ্নের সওদাগর'। এথেন্স অলিম্পিকের পর বেজিং অলিম্পিকেও আর্জেন্টিনা সোনা জেতে মেসির অনুপম ক্রীড়াশৈলির গুণে ও নেতৃত্বের দক্ষতায়।

এই মুহূর্তে বিশ্বকাপ ফুটবলে মেসির প্রতিদ্বন্দ্বী পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, ব্রাজিলের কাকা ও স্পেনের ফার্ণান্ডো তোরেস। তবে এবছরে মেসি যেরকম ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন ও ফর্মের চূড়ায় বিচরণ করছেন তাতে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপ মেসিময় হতে যাচ্ছে, সবকিছু ঠিক থাকলে। মেসির কোচ 'দেবদূত' মারাদোনা তো বহু সাক্ষাৎকারে বলেই ফেলেছেন মেসি তার যৌবনের দিনগুলি মনে পড়িয়ে দিচ্ছেন। এখনই সে আমার মতো খেলছে। মাত্র ২৫ বছর বয়স। এরপর ও আমাকেও ছাপিয়ে যাবে এবং বিশ্ব ফুটবলের সর্বোত্তম জিনিয়াসের স্বীকৃতি পাবে। মারাদোনা হয়ত অবেগে অতিশোয়াক্তি করে ফেলেছেন।

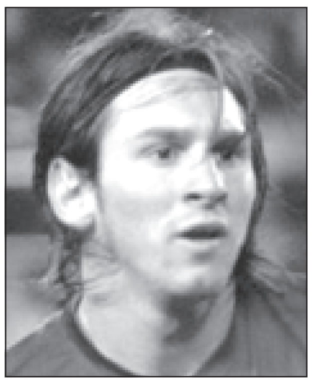

মেসি

কারণ পেলে, মারাদোনা, পুসকাস, ডিস্টিকানোরা সারাবিশ্বের সম্পদ। তাঁরা সুপারম্যান, সুপার ন্যাচারাল ক্ষমতা, প্রতিভার অধিকারী। মেসি হয়ত তাঁদের প্রায় সমগোত্রীয় হতে পারেন, ছাপিয়ে যাবেন কিনা তার উত্তর মহাকালের গর্ভে নিহিত।

তবে মারাদোনার স্বীকৃতি যিনি আদায় করে নিতে পারেন, তিনি তো অবশ্যই সৃষ্টিশীল মহাপ্রতিভা। এ বছর তাঁর ক্লাব বার্সেলোনাকে দুনিয়ার বাঘা বাঘা দলগুলি আটকাতে হিমসিম খাচ্ছে। গত বছর বার্সেলোনা বিশ্ব ক্লাব কাপ চাম্পিয়ন হয়েছে। মেসি ছিলেন গোটা টুর্নামেন্টে অপ্রতিরোধ্য। ইউরোপীয়ান ক্লাব ফুটবলে শক্তসমর্থ

মারাদোনা

ডিফেন্ডাররা তাকে জোনাল বা পজেশনাল কভারিং করেও ধরে রাখতে পারছে না। মেসি কখন কোন পায়ে ড্রিবল করবেন বা কোন দিকে ইনসাইড বা আউটসাইড ডজ করে বেরিয়ে যাবেন তা নিয়ে ধন্ধে থাকেন সব ডিফেন্ডার। সঙ্গে রয়েছে চোরাগতি ও জিমনাস্টের মতো বডিফেইন্ট। তবে একদিক থেকে রোনাল্ডো এগিয়ে মেসির থেকে। তা হলো রোনাল্ডো ইনসাইড অপারেটিং-এর পাশাপাশি চমৎকারভাবে উইংটাকেও ব্যবহার করেন। মেসি সবসময় মাঝখান থেকে অপারেট করেন। তার অবশ্য দরকার পড়ে না উইংপ্লের।

পর্তুগালের হয়ে রোনাল্ডোকে যে, ওয়ার্কলোড নিতে হয় তার তুলনায় অনেক রিল্যাক্স করে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে পারেন মেসি। আর্জেন্টিনা হেভিওয়েট দল, প্রতিটি পজিশনেই রয়েছে উঁচু মানের খেলোয়াড়। মেসিকে অ্যাটাকিং থার্ডে সাহায্য করার জন্য আছেন আর এক বিস্ময় প্রতিভা কার্লোস তেভেজ, মারাদোনার জামাই আওইয়েরা, রিকলমেরা। মাঝমাঠ থেকে বহুমাত্রিক ছন্দোবদ্ধ আক্রমণ তুলে আনে আর্জেন্টিনীয়রা। মেসি তারপর শেষ কাজটি করেন। বিপক্ষ সেন্ট্রাল ডিফেন্স বা সাইড-ব্যাকরা কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝড়ের গতিতে ডিফেন্স ভেদ করে গোল করে চলে যান মেসি। দু'দুটো অলিম্পিক বা বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ধারণী ম্যাচগুলিতে আর্জেন্টিনা ঠিক এভাবেই খেলে সাফল্য পেয়েছে। এই সাফল্য বিশ্বকাপেও ধরে রাখতে মরীয়া মারাদোনা।

তার ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপ্টা বয়ে গেছে এক বছরে। মাঝে দু'মাস তাকে ফুটবলের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখতে দেয়নি ফিফা। যে কোনোভাবে মারাদোনাকে সমস্যায় ফেলতে পারলে ফিফার ষোলোকলা পূর্ণ হয়। এত রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোত্তম চরিত্রকে, যা লিখতে বসলে মহাভারত হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও তাকে ঘাড় থেকে ফেলে দেওয়া যায়নি বা তার হাত থেকে ব্যাটন কেড়ে নেওয়া যায়নি। মারাদোনা কোচ হিসেবে কতবড় তা এখনো পরীক্ষিত নয়। তবে আর্জেন্টিনার প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। খেলোয়াড় জীবনে যেমন দেশের জন্য সবকিছু করেছেন, কোচ হিসেবেও দেশকে কিছু ফিরিয়ে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ মারাদোনা।

কেবল মারাদোনার মুখ চেয়েই মেসি, তেভেজরা এই বিশ্বকাপটি জিততে এককাট্টা হয়ে মাঠে নামবেন। মেসি নিজেও জানেন অলিম্পিক সোনা, বার্সেলোনার হয়ে ইউরোপ ও বিশ্বক্লাব কাপে চাম্পিয়ন হবার থেকেও বিশ্বকাপ জেতার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বেশি। আর ১৯৮৬-র পর আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জেতেনি। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল সাম্প্রতিক-কালে দু'বার বিশ্বকাপ জিতেছে, একবার রানার্স হয়েছে। এ ব্যাপারটিও 'ইগোকে' ক্ষতবিক্ষত করে, বিবেকের দংশনে জ্বলতে হয় প্রতিমুহূর্তে। দেশবাসী তৃষ্ণার্ত নয়নে চেয়ে আছে আবার কবে বিশ্বকাপ আসবে। মিডিয়াও যে তাঁকে মারাদোনার উত্তরসূরী বানিয়েছে তারও প্রতিফলন দিতে হবে। সব মিলিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপই হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে জীবনের চেয়ে বড় কিছু করে আসতে পারলে ইতিহাসের ধ্রুবতারা হয়ে উঠবেন মেসি, তেভেজরা।

খেলার জগৎ

বলিউডি চলচ্চিত্রে মিলখা সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতবর্ষের এককালের সেরা অ্যাথলেটিক মিলখা সিং-এর জীবন নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি হচ্ছে এবং তা সাধারণ মানুষের কাছে আসতে আর দেরী নেই। এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তির জানা-অজানা অনেক তথ্য, কষ্টের মধ্যে দিয়েও তার বেড়ে ওঠা, ১৯৫৮ সালে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের জন্য সোনা জয় ইত্যাদি নানা তথ্য এই ছবিটি থেকে পাওয়া যাবে। এক কথায় তথ্যচিত্রটি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে খুবই সাহায্য করবে।

মিলখা সিং-এর কথা অনুসারে এই ছবিতে তাঁর সম্বন্ধে বহু তথ্য থাকলেও তার পরিচিত হাস্যকৌতুক এই ছবিতে থাকবে না। চোদ্দ বছর বয়সে মিলখার চোখের সামনে তাঁর বাবা মাকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়— ১৯৪৭ এর দেশভাগকে কেন্দ্র করে দাঙ্গার সময়। এর পরেই তিনি তার অ্যাথেলেটিক জীবন শুরু করেন। ১৯৬০-এর রোমের অলিম্পিক এ তার নতুন নামকরণ হয় "উড়ন্ত শিখ"। যারা তার সময়কালের ছায়াছবি যেমন আওয়ারা, শ্রী, ৪২০-এর মতন ছবি দেখেননি, তাদের কাছে তাঁর জীবনের উপর একটি পুরো বলিউডি ছবি হওয়া খুব বিস্ময়কর এবং আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। উল্লেখ্য, তিনি তাঁর নিজের জীবনের গল্প চলচিত্রে রূপ দেওয়ার বিনিময়ে দক্ষিণা হিসেবে নিয়েছেন মাত্র ১ টাকা।

সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন তিনি ঘুম থেকে ওঠার সময় থেকে সমস্ত দিন দৌড় অভ্যাসে ব্যস্ত থাকতেন। তার দৌড়কে আরও গতিসম্পন্ন করে তোলবার জন্য ১৯৫৮ সালে কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয়ী ডেনিকিন্সজীর কাছ থেকে পরামর্শ নিতেন এবং তাঁর পরামর্শ মতো নিজেকে তৈরি করেন। তাঁর এই কঠোর পরিশ্রমের ফল হিসেবে ১৯৫৪ সালে কমনওয়েলথ গেমসে তিনি সোনা জেতেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর এই কীর্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী ভারতে একদিনের রাষ্ট্রীয় ছুটির ঘোষণা করেন।

বর্তমানে সত্তর বছর বয়সী অ্যাথলেটিক-এর এখন বক্তব্য হলো এক সময় মানুষ তাঁকে উড়ন্ত শিখ বলতো। কিন্তু বর্তমানে তাঁকে হাঁটবার জন্য সাহায্য নিতে হয়। মিলখা সিং এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি ভারতবর্ষকে প্রথম বিশ্ব অ্যাথেলেটিক্স-এর মানচিত্রে তুলে ধরেন।

শব্দরূপ - ৫৪৬

সর্বাণী ভদ্র

১	২			৩	■	■	■
■		■	■		■	৪	৫
৬		৭	■		■	■	
■	■		■	৮	৯		
১০			১১	■		■	■
	■	■		■	১২	১৩	
১৪		■		■	■		■
■	■	■	১৫				

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ **১.** দেশলাইয়ের কাঠি, প্রথম দুয়ে প্রদীপ, দুয়ে-চারে প্রবাল, **৪.** রামচন্দ্রের পিতামহ, **৬.** তৎসম শব্দে পৃথিবী, ভূমি, **৮.** ইষ্টমন্ত্রাদি করার সময় যে মালার গুটিকা গোনা হয়, **১০.** নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র ও দ্রোণাচার্যের শিষ্য, **১২.** প্রতিশব্দে গ্রথিত, শোভিত, আগাগোড়া আঁচড়, **১৪.** তৎসম বই, পুঁথি, **১৫.** রাম বনবাসকালে এই অরণ্যে ১১ বৎসর বাস করেছিলেন, একে-চারে মূল্য।

উপর-নীচ ঃ **২.** তৎসম শব্দে পাতা, গাছের নতুন পাতা, **৩.** সৈন্যদের যুদ্ধকৌশল শি(া, ড্রিল, আগাগোড়া কর্ম, মধ্যে স্টিভ ত্রি(কেটার, **৫.** মহর্ষি সত্যকামের মাতা, আগাগোড়া বিল, শেষ দুয়ে বলয়, **৭.** সপ্ত পাতালের অন্যতম, **৯.** যাচাই, গুণাগুণ পরী(া, **১০.** তৎসম শব্দে বিশেষণে অনন্যমনা, একনিষ্ঠ, অভিনিবিষ্ট, **১১.** বি(-ষণ বা পৃথককরণ, **১৩.** তৎসম শব্দে কেশ, চুল, বিশেষণে চঞ্চল, অস্থির।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৪৪

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯
রঞ্জন দাস, বেলেঘাটা,
কলকাতা-১০

■	অ	রু	ণ	■	ব	■	■
■	■	দ্র	■	■	রা	ঘ	ব
অ	■	জ	তু	গৃ	হ	■	ভ্রু
প	রো	টা	■	ধ্র	■	■	বা
রা	■	■	শি	■	পু	ল	হ
জি	■	অ	ব	তা	র	■	ন
ত	ক্ষ	ক	■	■	ন্দ	■	■
■	■	চ	■	ভ	র	ত	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৪৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৪ মে, ২০১০ সংখ্যায়

সামারাঞ্চে র প্রয়াণে শোকস্তব্ধ অলিম্পিক দুনিয়া

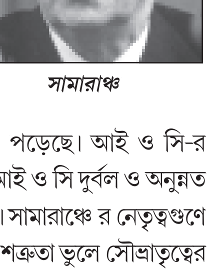

সামারাঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আধুনিক অলিম্পিক ও যিনি প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিলেন সেই জুয়ান আন্তোনিও সামারাঞ্চ চলে গেলেন। স্পেনের এই আন্তর্জাতিক কূটনীতিক প্রায় ৫০ বছর জড়িয়ে ছিলেন অলিম্পিক আন্দোলনের সঙ্গে। আর আইরিশ 'লর্ড' কিলানিনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে টানা দুই দশক আই ও সির প্রেসিডেন্টের গুরুদায়িত্ব পালন করে গেছেন। তাঁর আমলেই ২২২টি দেশ আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদস্য হয়ে এই বিশ্বজনীন সংগঠনটিকে সব অর্থেই আধুনিক পৃথিবীর অভিভাবক রূপে তুলে ধরেছেন। ৬টি মহাদেশের কোণায় কোণায় অলিম্পিকের চিরন্তন মহিমা ও দর্শন ছড়িয়ে পড়েছে। আই ও সি-র অর্থভাণ্ডারে জমা হয়েছে কয়েক হাজার কোটি ডলার। যা দিয়ে আই ও সি দুর্বল ও অনুন্নত দেশগুলির ক্রীড়া ও সংস্কৃতির সর্ব বিভাগে সহযোগিতা করে থাকে। সামারাঞ্চে র নেতৃত্বগুণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন (পরে রাশিয়া) পারস্পরিক শত্রুতা ভুলে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। তাঁর আমলে একমাত্র ১৯৮৪-র লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিক বাদে প্রতিটি বিশ্ব অলিম্পিক সফল হয়েছে সব মহাদেশের প্রতিটি দেশের অংশগ্রহণে। বয়কট, হাঁটা অলিম্পিক অভিধান থেকে মুছে দিতে পেরেছেন সামারাঞ্চ । সব ধর্ম, রাজনৈতিক মতাদর্শকে অলিম্পিকের পঞ্চ বলয়ে জুড়ে দিয়ে সব অর্থেই অলিম্পিককে এক আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাইতো রাষ্ট্রসংঘ তাঁকে শতাব্দীর সেরা আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠক কূটনীতিকের স্বীকৃতি দিয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ সাতশো কোটি মানুষের এই অলিম্পিক সভ্যতা-সংস্কৃতি। বিশ্ব মানবতা হারাল এক বিবেকী চিন্তাবিদকে।

নব্বই হাজার পাকিস্তানী ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে

(১ পাতার পর)

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ওখানকার কবি-লেখককুলও দিল্লী-লক্ষ্ণৌ-কলকাতা নিয়ে যত না সাহিত্য রচনা করেছেন তার থেকে অনেক বেশি কালি খরচ করেছেন 'মুম্বাই' নিয়ে। প্রত্যেক পাকিস্তানীর একটা একান্ত বাসনা থাকে—জীবনে অন্তত:পক্ষে একবার মুম্বাই বেড়িয়ে আসি। পাকিস্তান থেকে নিয়মিতভাবে পাকিস্তানীরা মুম্বাই যাতায়াত করতে থাকে—কখনও ব্যবসায়ী, কখনও চিত্রাভিনেতা-নেত্রী, কখনও সন্ত্রাসবাদী হয়ে। যদি এ ঘটনা না ঘটত তাহলে কি ভারতের অন্যান্য শহরের তুলনায় মুম্বাইয়ে এত বিরাট সংখ্যক পাকিস্তানী বেআইনীভাবে বসবাস করত?

আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তানীরা মুম্বাইয়ে পৌঁছায়। কিছু ফিরে গেলেও অনেকেই মুম্বা দেবীর বাসস্থান (অবস্থান)-কে বিধ্বস্ত করার জন্য মুম্বাইতেই আড্ডা গাড়ে। মুম্বাই পুলিশ তাদের খোঁজখবর রাখে না এমন নয়, তবে খুবই কম তাদের হাতে ধরা পড়ে। মুম্বাইয়ে বিদেশ থেকে এসে যারা জনারণ্যে হারিয়ে যায় তাদের মধ্যে পাকিস্তানী ও বাংলাদেশীদের সংখ্যাই (পড়ুন মুসলমান) সর্বাধিক।

যখন মুম্বাইয়ে ভারত-পাক ক্রিকেট ম্যাচ হয় তখন পাকিস্তানীদের পক্ষে ভারতে ঢুকে পড়ার সুবর্ণ সুযোগ। গতবার পাক-ভারত ক্রিকেট খেলা দেখতে আসার জন্য পাকিস্তানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস পাঁচ হাজার পাকিস্তানীকে ভিসা দিয়েছিল। তারপর তিনবছর পার হয়ে গেছে, অথচ তাদের মধ্যে ১৭০০ পাকিস্তানী ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও ফেরৎ যায়নি। প্রশাসন অনেক খুঁজেও তাদের পাত্তা করতে পারেনি। তাহলে কী তারা মাটি ভেদ করে ঢুকে গেছে? বছরে বছরে নানা বাহানায় ২/৪ বার এরকম সুযোগ আসে আর দলে দলে পাকিস্তানীরা ভারতে ঢুকে পড়ে। ক্রিকেট আর সিনেমা—এই দুটোই সবথেকে সহজ পথ। এর সঙ্গে রয়েছে ট্রেন যোগাযোগ। দিল্লী—লাহোর সমঝোতা এক্সপ্রেস এবং রাজস্থান থেকে পাকিস্তানের মুনাবাও ট্রেন চলাচল। প্রতিদিনকার বাস যোগাযোগও রয়েছে। এসব মিলে পাকিস্তানীদের ভারতে ঢুকে পড়াটা এখন জলভাত। পাকিস্তান থেকে যে বাস ভারতে আসে তাতে সব সময়ই ভীড় লেগে থাকে—সীট পাওয়া যায় না। আসার জন্য কত না চাহিদা। একবার আসার পর আর সহজে কেউ ফেরৎ যেতেই চায় না। রহস্যটা কি?

আগে মুম্বাইবাসী পাকিস্তানীদের যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা মুম্বাই মহানগর নিগম, টাটা সমাজবিজ্ঞান সংস্থানের সমীক্ষার ভিত্তিতে তৈরি করা। কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিই টাটা সমাজবিজ্ঞান সংস্থানকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে পারবেন না। ওই তথ্যও ২০০৭ সালের। টাটা সমাজবিজ্ঞান সংস্থানের বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে। সংস্থাটি সর্বদা সঠিক বাস্তব তথ্যই দিয়ে থাকে। জল মেশায় না। তবে প্রদত্ত তথ্যের পরিসংখ্যান কমতে-বাড়তে পারে। ১৯৬১ সালে মুম্বাইয়ের জনসংখ্যায় পাকিস্তানীদের সংখ্যাটা ৪.১৭ শতাংশ ছিল। ১৯৭১-এ ৩.০৫ শতাংশ, ১৯৮১ তে ২.০৬ শতাংশ এবং ১৯৯১-এ পাকিস্তানীদের সংখ্যা দাঁড়ায় মুম্বাইয়ের জনসংখ্যার ১.৩২ শতাংশ। ২০০১-এ তা কমে হয় প্রায় ১ শতাংশ। এখানে সোজাসাপটা কথাটা হলো যেখানে ১ জন পাকিস্তানীও ভারতের পক্ষে বিপদের কারণ—সেক্ষেত্রে এক শতাংশ তো বিশাল ব্যাপার।

মৌন পুলিশ বিভাগ : মুম্বাই মহানগরের পুলিশ বিভাগে বিদেশী নাগরিক সম্পর্কিত একটি পৃথক সেল রয়েছে। এই বিভাগটির কাছে সবরকম খবরাখবর থাকে। কিন্তু মুম্বাই পুলিশ তাকে আদৌ গুরুত্ব দেয় না। যখন বাংলাদেশীদের বিষয়ে বলা হয় তখনও মুম্বাই পুলিশ মৌনীবাবা সেজে থাকে। এরপর আবার যখন ভোটার তালিকায় পাকিস্তানী ও বাংলাদেশীদের কেউ চিহ্নিত করেন, তখনও পুলিশ বিভাগের মৌনব্রত

ধারণ করে থাকাটা বিশেষ বিস্ময়ের। বিশ্বাস হতে চায় না। হতে পারে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার প্রদত্ত পরিসংখ্যান সার্বজনিকভাবে তারা প্রকাশ করতে চান না, বা উচিৎ মনে করেন না। কিন্তু এখন 'তথ্যের অধিকার' আইন পাশ হওয়াতে সঠিক তথ্য প্রদান করতে সরকার বাধ্য। এখন আর একথা কারও কাছেই গোপন নেই যে, মুম্বাই মহানগর নিগম এর দুটি ওয়ার্ডে হারজিৎ নির্ভর করে ওই ধরনের ভোটারদের ভোটের উপরই। টাটা সমাজবিজ্ঞান সংস্থান এ ব্যাপারে যে বিশ্বস্ত সংবাদ দিয়েছে, তারজন্য মুম্বাই মহানগর নিগমের কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ। সরকার বার বার বাস্তব তথ্যকে ধামাচাপা দিয়ে আড়াল করে চলেছে। তার ফলে বিদেশী সন্ত্রাসবাদীদের এদেশে গোপন ঘাঁটি গাড়তে সুবিধা হয়। পুলিশী পরিভাষায় এরকম গুপ্ত আড্ডা 'স্লিপার সেল' বলে অভিহিত। যতক্ষণ পর্যন্ত বিদেশ থেকে আসা সন্ত্রাসবাদীরা এদেশে অবস্থানরত পঞ্চমবাহিনীর সাহায্য না পায় ততক্ষণ তাদের পক্ষে ষড়যন্ত্র ও আঘাত করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই সন্ত্রাসবাদীরা সক্রিয়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো—ওই সন্ত্রাসীরা এদেশের তথাকথিত ভারতীয়দের কাছ থেকে সবরকম সাহায্য পাওয়াতে তাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়।

এদেশীয় সতীর্থদের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন পাওয়ার কারণেই আজ 'সিমি', 'ইণ্ডিয়ান মুজাহিদিন' নামক সন্ত্রাসী জেহাদিরা ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মাথাব্যথার কারণ। ওই জেহাদিদের সহচর-অনুচরদের জন্য মুম্বাই নিরাপদ বলেই মনে করা হয়। এজন্য একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাচ্ছে—১৯৯৩ এর বিস্ফোরণ থেকে শুরু করে ২০০৮ এর ২৬/১১ সন্ত্রাসী হামলায় ওই ভারতীয় পঞ্চমবাহিনীর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুম্বাই এদের জন্য সহজ সরল বিচরণস্থল —কারণ এখানে তাদের কখনও টাকার অভাব হয় না। টাকা যোগাবার লোকের খামতি নেই। ফলে জেহাদির জন্য মুম্বাই বিশেষ পছন্দের জায়গা। মুম্বাইয়ে হাওলার মাধ্যমে অর্থের যোগান বা চালান আসে। মুম্বাইয়ের সামুদ্রিক জলসীমা তো জেহাদিদের জন্য পড়ে পাওয়া আঠারো আনা সুবিধা। মহারাষ্ট্রের সামুদ্রিক তটরেখা ৭৫০ কিলোমিটার। এটা মুম্বাইয়ে হামলার জন্য পাকিস্তানী জেহাদিদের ঢোকা, থাকা, অবাধ যাতায়াতের জন্য দারুণ সুবিধাজনক।

ভারতের শত্রুরা সদাসর্বদা মুম্বাইয়ে আঘাত করার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। পাকিস্তানী দুর্বৃত্তরা নানাসূত্রে মুম্বাইয়ে ঢুকে পড়ে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চার চারবার সরাসরি সামনাসামনি যুদ্ধ হয়েছে। ওই সময়কালে পুলিশ সর্বাধিক সংখ্যক পাকিস্তানীকে মুম্বাই থেকে আটক করেছিল। সেজন্য এব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই যে, মুম্বাই পাকিস্তানীদের জন্য দীর্ঘকাল ধরে সুপরিচিত এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য।

নিরাপত্তার বিষয়ে দুর্লক্ষ্য : মুম্বাইয়ে সারা ভারত থেকেই নানা কারণে ভারতীয়রা বসবাস করে। সেজন্য লুকিয়ে থাকার জন্য বেশ-ভূষা, এলাকা, আদব-কায়দা পরিবর্তন করার দরকার হয় না। সব রং, জাত-পাত, উপাসনা পদ্ধতি, আকার-প্রকারের মানুষ রয়েছে। মুম্বাই ভৌগোলিক দিক থেকেও যাতায়াত যোগাযোগের জন্য সহজ সুগম। মুম্বাই দুটি ভাগে বিভক্ত, সেজন্য ওখানে একপক্ষকে উত্তেজিত করা, দাঙ্গা লাগানো ভাঙচুর করাও সহজ। এই সকল কারণেই মুম্বাইকে জেহাদি-সন্ত্রাসীরা বারবার নিশানা করেছে। আজও ১৯৭১-এর আগে থেকে বাংলাদেশে বসবাসকারী পাকিস্তানীদের জন্য মুম্বাইয়ে আসা, নিজ নিজ গোষ্ঠীর মুম্বাইবাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে যাওয়া জলভাত। বাংলাদেশীরা (মুসলমান) এদেরকে শুধু সাহায্য করে তাই নয়, এদের যে কোনও কাজ অল্প পারিশ্রমিকেই করে দেয়। যখনই কোনও পাকিস্তানী ভারতের ভিসার জন্য আবেদন করে তখনই মুম্বাই পুলিশ নজরদারি শুরু করে দেয়। এই সতর্কতা ১২ মার্চ, ১৯৯৩-এর পর থেকেই বাড়ানো হয়েছে। ফলে খুব সহজেই হিসাব করা যায় বাইরে থেকে ভিসা নিয়ে আসা লোকেদের মধ্য থেকে কতজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মুম্বাইয়ে এসে ওরা কোথায় গেল তা বের করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তবে যতই অসম্ভব মনে হোক, যতই দুঃসাধ্য হোক, যতক্ষণ না ওই অবৈধভাবে লুকিয়ে থাকা বা ঘাঁটি গেড়ে জমিয়ে বসা পাকিস্তানীদের ভারত থেকে বার না করা হচ্ছে ততক্ষণ ভারতের নিরাপত্তা রক্ষিত হবে না।

হেমতাবাদে ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত সারদা শিশু তীর্থ

হেমতাবাদ সারদা শিশু তীর্থ পুনঃনির্মাণের জন্য সাহায্যের আবেদন—গত ১৩ এপ্রিলের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ে উত্তরবঙ্গের উত্তরদিনাজপুর জেলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও কিছু প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। হেমতাবাদ এলাকায় হেমতাবাদে বিদ্যাভারতী (উত্তরবঙ্গ) পরিচালিত হেমতাবাদ সারদা শিশু তীর্থের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বাড়ি ভেঙে ছাউনি উড়ে সব তছনছ লণ্ডভণ্ড হয়েছে। চারশ শিশুর পঠন-পাঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ের সম্পাদক বিশ্বনাথ বসাক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ আট লক্ষ টাকা।

সারদা শিশু তীর্থ
(স্কুলের রেজি নং- W.B. Act XXVI of 1961. S/1L. 32830 of 2005-06)
হেমতাবাদ, উত্তরদিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ
দূরভাষ : ০৯৭৭৫৮২৯০১৯

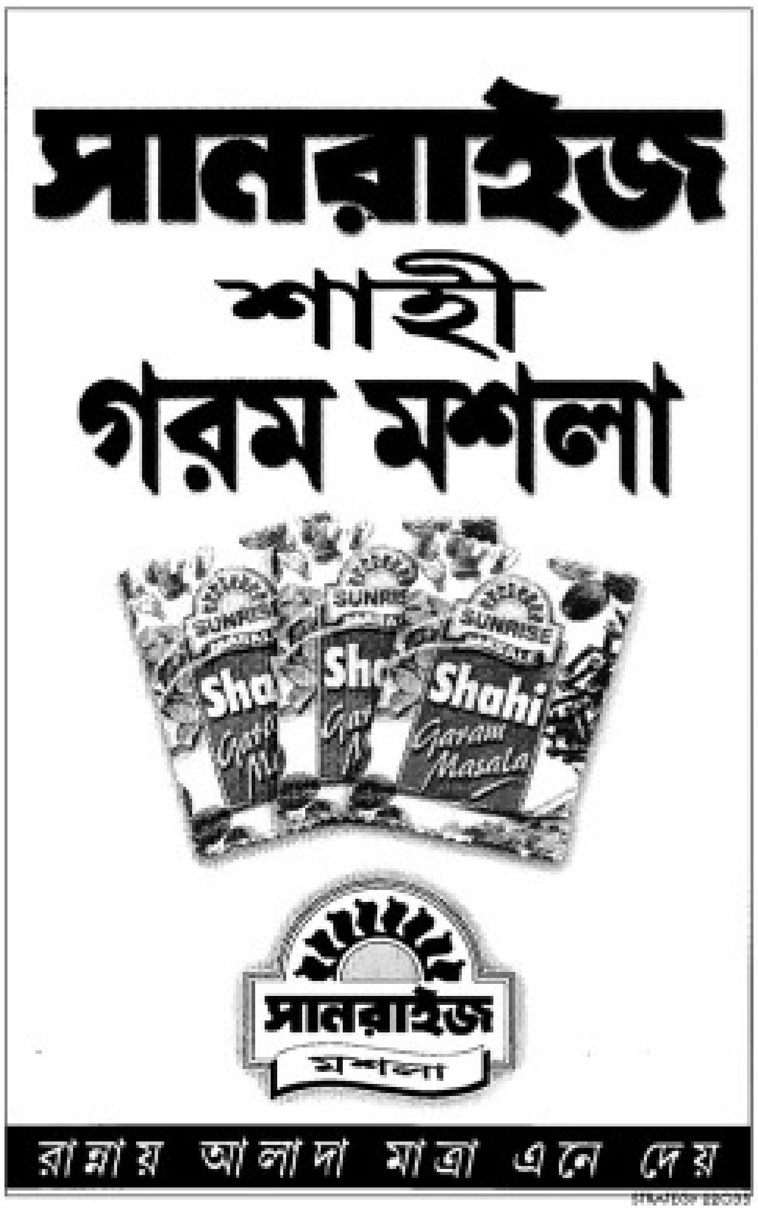

RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের 'আজাদ হিন্দ দিবস'

বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই মাওবাদী সমস্যার সমাধান

মঞ্চে রয়েছেন কমল ব্যানার্জী, মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলী এবং রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিজস্ব প্রতিনিধি।। "মাওবাদীরা দেশের পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ। এ সময়ে সংসদে সব দল মাওবাদী দমনে একমত হয়েছে। এটা ভালো। বলপ্রয়োগ করে এই সমস্যাকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। সারা পৃথিবীই 'মাওবাদ'কে বিসর্জন দিয়েছে। এমনকী মাও-এর নিজের দেশ চীনেও কার্যত মাওবাদকেই বাদ দেওয়া হয়েছে। এই জনহত্যার আদর্শ কোনও দেশের পক্ষেই গ্রহণীয় নয়।" গত ২৫ এপ্রিল কলকাতায় কেশব ভবন সভাগৃহে পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখা কর্তৃক আয়োজিত 'আজাদ হিন্দ দিবস' অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে উপরের কথাগুলি বলেন পূর্বসৈনিক সেবা পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি মেজর জেনারেল কে কে গাঙ্গুলী (অবসরপ্রাপ্ত)। তিনি আরও বলেন, নেতাজীর জীবন দেশের নাগরিকদের প্রজন্মের পর প্রজন্মকে প্রেরণা দিতে পারে। এই বিষয়টি পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। সরকারকেই এই কাজ করতে হবে। নেতাজীর জীবনের শেষ পরিণতি দেশের মানুষ জানতে চায়। তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় যে তাঁর মৃত্যু হয়নি এটা আর অজানা নেই।

দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষ দারুণ গরীব। এই পরিণতির জন্য ভ্রষ্টাচারকেই দায়ী করেন জেনারেল গাঙ্গুলী। একজন সৈনিক অবসরের পরও সৈনিকই থাকেন। দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে তারা সর্বদাই প্রস্তুত। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আর এস এস-এর ক্ষেত্র-সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অ্যাডভোকেট কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিভূষণ দাস ও সুজিত কুমার দাস প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন ক্যাপ্টেন সুশান্ত দে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নায়েক (অব) দেবীপ্রসাদ মিত্র। এদিন পূর্বসৈনিক সুজিতবাবু শ্রীচৈতন্যদেবের একটি বাঁধাইকরা বড় ছবি সভাকক্ষে রাখার জন্য নিয়ে এসেছিলেন। জেনারেল গাঙ্গুলি তা ক্ষেত্রসঙ্ঘচালকের হাতে তুলে দেন। সঙ্ঘের ভারতীর প্রবীণ কার্যকর্তা ও সুগায়ক পূর্ণচন্দ্র পুইতুণ্ডির কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ দিয়ে সভা শুরু হয় এবং শেষে উপস্থিত সকলে 'জনগণমন' গীতটি দাঁড়িয়ে গাওয়ার পর সভার সমাপ্তি হয়। প্রসঙ্গত, পূর্বসৈনিক সেবা পরিষদ প্রতিবছরই দেশজুড়ে আজাদ হিন্দ দিবস ও বিজয় দিবস (১৯৭১-এ বাংলাদেশে যুদ্ধজয়) পালন করে থাকে।

বনবাসী সেবা এবং সংগঠন কাজের বিস্তারের উদ্দেশ্যে
শ্রীমদ্‌ভাগবত কথা জ্ঞানযজ্ঞ
এবং ১০৮ ভাগবত পারায়ন
শ্রী অতুল কৃষ্ণ ভারদ্বাজজীর শ্রীমুখ নিঃসৃত

তারিখ ঃ ২৫ এপ্রিল থেকে ১ মে ২০১০, স্থান ঃ শ্রী বৈকুণ্ঠনাথ মন্দির, সময় ঃ দুপুর ১ থেকে ৫টা পর্যন্ত
সকল ভক্তগণকে সাদর আমন্ত্রণ
উদ্বোধন করবেন গোবিন্দরামজী আগরওয়াল, প্রধান অতিথি মঞ্জুমনোত, বিশিষ্ট অতিথি ঃ কমল গান্ধী, সঞ্চালন করবেন ঃ স্নেহলতা বৈদ
পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম
কলকাতা-হাওড়া মহানগর মহিলা সমিতি
১৬১/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, রুম নং ৫১, বাঙ্গুর বিল্ডিং, কলকাতা ৭০০ ০০৭, দূরভাষ ঃ ২২৭৩৫৭৯২, ২২৬৮০৯৬২

প্রকাশিত হবে ১০ মে, '১০
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ১০ মে, '১০
রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে স্বস্তিকার শ্রদ্ধাঞ্জলি
"বৃদ্ধ সম্রাট কবি
এই তব জীবনের ছবি
এই তব নবমেঘদূত
অপূর্ব অদ্ভুত
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া
ভুলি নাই ভুলি নাই...।"
– রবীন্দ্রনাথের ভারতচিন্তার নানা দিক নিয়ে লিখেছেন –
ডঃ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস,
অসিতবরণ চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ।
সেইসঙ্গে থাকছে রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রা সেন-এর সাক্ষাৎকার।
।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ চার টাকা।।
সত্বর কপি বুক করুন।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম এর ......
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

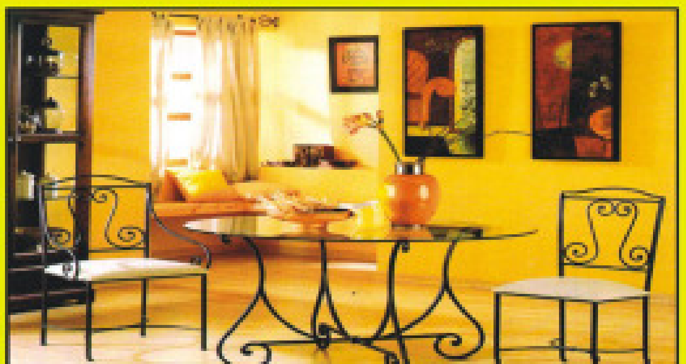

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com